তিস্তার কার্নিশে

দেবব্রত ঘোষ

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : কাতিক ১৩৫৮

প্রকাশক : শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ কল্পনা : পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর : শ্রীচিত্তজিৎ দে
অরোরা প্রিণ্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

উৎসর্গ

মা ও বাবার

স্মৃতিতে—

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলো। এই রকমভাবে কখনো ঘুম ভেঙে গেলে, যখন চারদিকে কেউ জেগে নেই, অন্ধকার আর নির্জনতা যেন ভারী একটা পাথরের মতো সমস্ত অস্তিত্বকে চেপে ধরে, নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হয়। চারদিকে কেউ কোথাও নেই, মৃত্যুর মতো অন্ধকারের একটা দ্বীপখণ্ডে পরিত্যক্ত অবস্থায় তিনি একা, এইরকম একটা বোধে এই সময় স্নায়ু চঞ্চল হয়ে ওঠে, চিৎকার করে কাউকে ডাকতে ইচ্ছে করে : তোমরা কি কেউ আছ ?

বন্ধ চোখেই দাশগুপ্ত সাহেব অসাড় উৎকণ্ঠায় কারো উত্তর শুনতে চেষ্টা করলেন। না, কোনো শব্দ নেই। একটা ভয়, কিসের ভয় দাশগুপ্ত জানেন না, মনে হলো তাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। তার চোখ পিঙ্গল, লিকলিকে অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা আঙুলে আদিম পিচ্ছিলতা, দাঁতগুলো হলদে আঁসটে, ঝুলে পড়া লোভী জিভে লালা ঝরছে, নিঃশ্বাসের তপ্ত আগুনে দুর্গন্ধ। সে এগিয়ে আসছে, যেন শরীরী মৃত্যু, যেন অনিবার্য ; এবং পতনের শেষ বিন্দুতে এসে দাশগুপ্ত সাহেব চিৎকার করে উঠে বসলেন।

কিন্তু তাঁর ভয় পাওয়া আড়ষ্ট গলায় চিৎকারের কোন শব্দ হলো না। কপালে, গলার ভাঁজে ঘাম। দাশগুপ্ত চোখ মেললেন। জানালার শার্শি ভেঙে বন্যার মতো জ্যোৎস্না ছুটে এসেছে ঘরে, ছিঁড়ে গেছে অন্ধকারের আড়াল, মায়ার জরিতে অস্তিত্বের রূপরেখা ফুটে আছে।

কালিম্পঙে জ্যোৎস্না ! আহ্, জ্যোৎস্না ! কতকাল পর হে তুমি করুণা !

দুর্গোৎসবের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই ছোটো পাহাড়ী শহরে প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। 'মিলনী' ক্লাবের প্রাঙ্গণে তৈরী হয়েছিলো মণ্ডপ, বিজয়ার পরদিন থেকে লক্ষ্মী-পুজো পর্যন্ত উৎসবকে মুখর করে রাখবার জন্য জলসা, নাটক আর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। পুজো হয়ে গেলো, বিসর্জনের পর মণ্ডপে কোলাকুলি হলো, মিষ্টিমুখ হলো, কিন্তু বাইরে বিজয়ার সন্ধ্যায় আকাশে সেই মলিন চাঁদ ছিল না। বিকেল থেকেই ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল, সন্ধ্যার মুখে বাতাসের বেগ বাড়লো। অন্যান্যবার বিসর্জনের পর ফাঁকা মণ্ডপে বসে পরস্পর রাত আটটা নটা পর্যন্ত যে আনন্দে কল্লোলিত হয়ে ওঠা, এবারকার আবহাওয়া তার সম্ভাবনাটুকু কেড়ে নিলো। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাঁর যাঁর বাড়ি ফিরে যাবার জন্য। কেউ কাছে থাকেন, কাউকে আবার যেতে হবে দূরে, ডেভেলোপ্‌মেন্ট এরিয়ার শেষ প্রান্তে। সন্ধ্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপ ফাঁকা হয়ে গেলো।

সেই বৃষ্টি নামলো ; অঝোরে, মুষলধারা বৃষ্টি। পরের দিনের নাটক বন্ধ করে দিতে হলো, বাতিল হয়ে গেলো জলসা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। একটানা, এক ঘেঁয়ে বৃষ্টি, যে যার বাড়িতে গৃহবন্দী। টিনের চালে অবিশ্রাম শব্দ, সবুজ গাছগুলি যেন কালচে হয়ে উঠছে, ফুলের পাঁপড়ি ঝরে যাচ্ছে। পাহাড়ে বর্ষার অভিজ্ঞতা সবারই আছে, কিন্তু এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতে প্রাত্যহিকতাও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে একদিন জিপটা নিয়ে বাজারের দিকে গিয়েছিলেন দাশগুপ্ত. দু-চারটি দোকান ছাড়া সব ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তায় লোক নেই, চারদিক অসম্ভব ফাঁকা বলে মনে হয়েছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, কি একটা নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রে একটা জনপদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফিরে আসবার পথে তাঁর একসময় ভয়ের অনুভব হয়েছিল।

সেই বৃষ্টি আজ থামল। আজ ত্রয়োদশীর রাত। শুতে আসবার সময়ও আকাশ নিশ্ছিদ্র ছিলো, হাওয়া এসে ধাক্কা মারছিল জানালার

বন্ধ শার্শিতে, বৃষ্টি পড়ছিলো অঝোরে। তিনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় কোথাও যেন কারো সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেছে, দাশগুপ্ত টের পাননি। কখন বৃষ্টি থামল, আকাশ থেকে মেঘের আস্তরণ খসে গেলো, শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ ফিরে এলো আবার।

কদিনের টানা বিরক্তির মধ্য থেকে উঠে বসলেন দাশগুপ্ত। একটু আগের দেখা স্বপ্নটা কোনো এক অতীত বিভীষিকার মতো পালিয়ে গেলো যেন, এই কয়েকটা দুঃস্বপ্নের দিনের মতোই। তাঁর এই মধ্য বয়সের মধ্যরাতে দাশগুপ্ত দেখলেন, বন্ধ জানালার পুরু পর্দার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো ঘরে এসে এক ধরনের আলো-আঁধারের মায়া সৃষ্টি করেছে। জানালার ওপরের দিককার যে সংকীর্ণ অংশটা পর্দায় ঢাকা পড়েনি, সেখান দিয়ে মুক্ত জ্যোৎস্না উল্টো দিকের দেয়ালের গায়ে এসে পড়েছে, যেন সংসারের গায়ে আকাশের হাত।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! বৃষ্টি থেমে গেছে!

দাশগুপ্ত বিছানা ছেড়ে নেমে এলেন। একবার ইচ্ছে হলো, পাশের ঘরে স্ত্রীকে ডাকেন, তারপর কি ভেবে ডাকলেন না। বরং খুব আস্তে, প্রায় নিঃশব্দে, পাছে স্ত্রী টের পান বা জেগে ওঠেন, তিনি গাড়ি বারান্দার দিককার দরজাটা খুললেন। গাড়ি বারান্দার ছাদে এসে দাঁড়ালেন এক অধীর আগ্রহে, ফুসফুসে একটু আলো নিতে চান তিনি।

মাথার ওপরে ত্রয়োদশীর চাঁদ পশ্চিম দিকে একটু হেলে পড়েছে। সমস্ত পৃথিবী যেন সেই স্তিমিত চাঁদের আলোয় মোহযাপন করছে। পৃথিবী প্রকাশিত হয়েছে আপন আনন্দে, মোমের আলোর মতো তার প্রকৃতি যে এতো মৃদু আর কম্পিত, দাশগুপ্তর তা জানা ছিল না। তিনি পূবদিকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিকে ঘন-সবুজ কাফের অরণ্যভুমি; এতদিন যেমন দেখে এসেছেন, তেমনি স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভেজা অরণ্যভুমিতে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে তার গাঢ় সবুজ রং। এই অস্পষ্ট-

তার মধ্যে, দাশগুপ্ত বুঝতে পারেন না তাঁরই চোখের ভুল কিনা, একটা হলদে ক্ষতের মতো, অরণ্যের একটা দিকে এক বিরাট ফাঁকা অংশ, আকাশের দিকে হাঁ করে রয়েছে। দাশগুপ্ত প্রথমে একটু অবাক হলেন যেন। ঐ বন তিনি রোজ দেখছেন, এবং তাঁর মনে হচ্ছে যেন ওই ফাঁকা অংশটার দিকেও অরণ্যভূমি বিস্তৃত ছিলো। কাফেরের ওই বন প্রায় পাহাড়ের সানুদেশ পর্যন্ত নেমে এসে রেলি নদীর একটু ওপরে শেষ হয়েছে। মাঝখানে ওই ফাঁকা-অংশটা কি সেখানে ছিল? দাশগুপ্ত ঠিক মনে করতে পারলেন না। তবে ধস্? এ-কদিনের বৃষ্টিতে পাহাড়ের বুক থেকে এক টুকরো অক্ষয় সবুজ খসে পড়েছে? হতে পারে; কিন্তু শেষরাতের চাঁদে অতদূরের সব কিছু তেমন বোঝা যাচ্ছে না।

বুঝতে চেষ্টাও করলেন না দাশগুপ্ত। আজ তাঁর মনে অফুরন্ত খুশি। তিনি দক্ষিণের দিকে তাকালেন। সেদিকে দুর্পিন পাহাড়ের সৈন্যদলের ছাউনিগুলি সারি সারি ছড়িয়ে আছে চারদিকে, পাহাড়ের চূড়োয় শাদা বৌদ্ধ গুম্ফা জ্যোৎস্নার আলোয় একটা স্থির কবুতরের মতো দেখাচ্ছে। মন্ত্রপূত কাপড়ের টুকরোগুলো বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, কতগুলি রহস্যময় অলৌকিক নিশান, সামান্য হাওয়াতেই কেঁপে কেঁপে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। ওই তরঙ্গিত নিশানের দিকে তাকালে শরীরে এক ধরনের অনুভূতি হয়, শাণিতের মুখোমুখি দাঁড়ালে শিরদাঁড়া দিয়ে যেমন এক ঠাণ্ডা ধারা প্রবাহিত হয়ে যায়, অনেকটা সেই রকমের অনুভূতি। এই নির্জন নিঃশব্দ রাতে সেই দিকে তাকিয়ে এতদূর থেকেও দাশগুপ্তর সেইরকম একটা অনুভূতি হলো।

তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। এই দিকে তিস্তা। এখান থেকে তিস্তা অনেক দূরে আর নিচে, কিছুতেই দেখা যায় না। কিন্তু এদিককার সমস্ত উপত্যকা তিস্তা-উপত্যকা, তিস্তার গা ছুঁয়ে উঠে এসেছে চারদিককার পাহাড়ী চড়াই, তিস্তার অস্তিত্বের ঘোষণা করে যায়। তবু আজ এই মুহূর্তে

স্থির উপত্যকায় মাত্র নয়, তিস্তা যেন উঠে আসছে দ্বিতীয় অস্তিত্বে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে নিচের দিক থেকে উঠে আসছে গর্জন, প্রবল গম্ভীর ক্রুদ্ধ গর্জন। তিনি এতদিন যাবত এখানে আছেন, তিস্তার এই ভয়াল আর্তনাদ কোনো দিন শোনেননি দাশগুপ্ত। তাঁর মনে হলো, একটা ক্রোধ শব্দের শরীর নিয়ে উপত্যকাময় হাহা-কারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন একটা পরিণাম উদ্যত হয়ে উঠছে। দাশগুপ্ত একসময় কেঁপে উঠলেন, কোনো কোনো কণ্ঠস্বর যে এমন শাণিত হয়ে ওঠে, তিনি তা জানতেন না। তাহলে ভয় পাচ্ছেন দাশগুপ্ত? কিসের ভয়? পরিণাম?

পরিণাম, পরিণাম, ভাবতে ভাবতে বা ভুলতে ভুলতে দাশগুপ্ত দ্রুত অন্যমনস্ক হয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন উত্তরের দিকে তাকিয়ে দেখতে, সেখানে বরফ পাহাড়। উত্তর দিকটা এখান থেকে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না, মাঝখানে তাঁর বসবার ঘর একটা বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। তবু তার খণ্ড অবয়বে ধরা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা, জ্যোৎস্নার আলোয় স্নিগ্ধ, শরীরী ধ্যানের মতো। শেষ রাতের কাটা চাঁদের আড়ালে তিনি আরো কতদিন দেখেছেন এই ছবি, যেখানে পার্থিব-অপার্থিবের সীমারেখা মুছে গিয়ে জটিল মমতার পটরেখা। আজও দেখলেন। চাঁদের আলোয় দেখলেন চিরায়ত মলিন, শুভ্র, স্থির, অসহায়ভাবে অচঞ্চল।

একসময় দাশগুপ্ত ভেতরে শীত অনুভব করলেন। এই পাহাড়ী জায়গায় অনেক আগেই শীত পড়তে শুরু করেছে, এই শেষ রাতে খোলা গাড়ি-বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই শীতের অনুভব বেশ তীব্র বলে মনে হলো। তার ওপর দুই দিকের উপত্যকা থেকে হাওয়া বইছিল। যখন তিনি বাইরে এসেছিলেন, তাঁর খেয়াল ছিলো না, রাত-পোষাকের ওপর লংকোট পরে আসেননি। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু

তিস্তা, রেলি আর অন্যান্য ছোটোখাট পাহাড়ী নদী বা ঝোরার গোঙানী ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। কোনো রাত-পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। দাশগুপ্ত ঘরে ফিরে এলেন, আগের মতই সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দাশগুপ্ত হাল্‌কা খুশিতে বাইরে বেরিয়েছিলেন, ঘরে ফিরে এলেন একটা মন্থর মন নিয়ে। ঘরে এখনো জ্যোৎস্না, এবং তিনি সুইচ বোর্ডের কাছে এসে দাঁড়ালেন বাতি জ্বালবেন বলে। বাতি জ্বলল না। তাহলে এই দুর্যোগে ইলেকট্রিকের লাইন কোথাও খারাপ হয়ে পড়ে আছে, না কি ওই শেষ রাতের জ্যোৎস্নার বৃত্ত থেকে তাঁর মুক্তি নেই বলেই বাতি জ্বলল না? ঘুম ভেঙে ঘরময় যখন তিনি জ্যোৎস্না দেখেছিলেন, তিনি বাতি জ্বালতে চাননি, বরং ভেতরের একটা উচ্ছ্বাসে ছুটে গিয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দার ছাদে, জ্যোৎস্নার ভিতরে; কিন্তু এখন তিনি বাতি জ্বালতে চাইলেন। তাঁর মনের খুশি এখন অনেকটা শিথিল, অথচ বাইরের সমস্ত আয়োজনে অপরূপতা ছিল। প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের মনকে কখনো কখনো বিষণ্ণ করে দেয়, দাশগুপ্ত এই প্রথম তা দেখলেন।

এই বিষাদ কেন, দাশগুপ্ত জানেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর এক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে করছিল। ঘরে টাইমপীসের শব্দটা সচল, এখন কত রাত? বালিশের পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তিনটে। পাশের ঘরে স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন, এই সময় তাঁকে ডাকা সম্ভব না। অর্থাৎ ইচ্ছে করলেও এখন কফি তিনি পাবেন না। অগত্যা চা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাঁর ঘরে ফ্লাস্কে সব সময় চা থাকে, মাঝে মাঝে যখন ইচ্ছে হয় একটু তিনি খান, এটা তাঁর সংসারের একটা অভ্যাস। দাশগুপ্ত টেবিল থেকে ফ্লাস্কটা তুলে নিলেন।

চেয়ারে বসে দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে কিছু ভাবছিলেন না, গরম চা খাওয়ার ভালো লাগার মধ্যেও তিনি সাধারণভাবে অন্যমনস্ক। ঘরে স্তব্ধ জ্যোৎস্না, ঘড়িতে সচল সময়, পাশের ঘরে নিদ্রিত স্ত্রী। এমনি

করে চেয়ারে বসে বসেই একসময় তাঁর তন্দ্রার মতো এলো, সেই তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠলো।

অশোক—

একটা নাম ধরে একটা চিৎকার, দমকা হাওয়ার ধ্বনির মতো, তাঁর টেবিলের পাশের জানালার শার্শিতে এসে আছড়ে পড়লো যেন। যেন ঝন্‌ঝন্‌ করে কেঁপে উঠলো জানলার কাচ, আর দাশগুপ্ত চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অশোক—

কেউ ডাকছে। কিন্তু চিৎকার নয়, যেন বৌদ্ধের প্রার্থনা, নিচু নম্র গলায় ক্লান্তিকর একটানা সুরের মতো শোনাচ্ছে। অশোক কে, দাশগুপ্ত ঠিক মনে করতে পারলেন না, কিন্তু এতো রাতে কে তাকে ডাকছে? দাশগুপ্তের মনে হলো, ডাকটা তাঁর বাড়ির পাশের রাস্তা ধরে নিচের দিকে নেমে গেলো।

তিনি তাড়াতাড়ি লং কোট-টা পরে নিলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টর্চ হাতে নিচে নেমে এলেন। গাড়ি বারান্দার সিঁড়িতে আসতেই রামবাহাদুর উঠে দাঁড়ালো।

সাব।

একটু আগে এখান দিয়ে একটা লোক গেলো, তুমি দেখেছ?

দেখেছি, সাব। ও ছিব-বস্তীর হিম্বল।

ছিব বস্তীর লোক এতো রাতে এখান দিয়ে কোথায় যাচ্ছে?

ও আমার কাছে এসেছিল, সাব।

তোমার কাছে?

রাম বাহাদুর হঠাৎ কেঁদে ফেললো।

দাশগুপ্ত স্তব্ধ।

কি হয়েছে, রাম বাহাদুর?

রামবাহাদুর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে, কোনো কথা বলল না। দাশগুপ্ত একটু অবাক হলেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, অশোককে

তুমি চেন ?

ও আমার মামাতো ভাই।

তোমার মামাতো ভাই ? দাশগুপ্ত এখন ছেলেটিকে যেন চিনতে পারলেন : রূপ বাহাদুরের ছেলে ?

রূপ বাহাদুর আর নেই, সাব। রাম থমথমে গলায় বললো, ধসে ওরা সব আজ মরে গেছে। শুধু অশোক বেঁচে আছে।

ধস্ ? দাশগুপ্ত অন্যমনস্কভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন বোধ-হয়, তারপরই বললেন, অশোক কোথায় ?

ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দাশগুপ্ত একটু থামলেন। ঝড়-জলে পাহাড়ে ধস, পাহাড়ে ধস নামা, তাতে মানুষের মৃত্যু ইত্যাদি এখানে বিচিত্র ঘটনা কিছু নয়। তবু আজকের সমস্ত রাতের অভিজ্ঞতায় এই ঘটনা দাশগুপ্তর কাছে অদ্ভুত বলে মনে হলো। দাশগুপ্ত অদ্ভুত চোখে রামবাহাদুরের দিকে একবার তাকালেন, বন্দুক হাতে সজাগ রাতপ্রহরী তাঁর অপিসের। বেঁটে, ফর্সা, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে জানে।

দাশগুপ্ত বললেন, রাম, তোমার মামাবাড়ির আজ এই অবস্থা, তুমি সেখানে গেলে না ?

ছ'টা পর্যন্ত আমার ডিউটি, সাব। রামবাহাদুর স্পষ্ট গলায় উত্তর দিলো।

দাশগুপ্ত আবার অদ্ভুতভাবে তাকালেন রামবাহাদুরের দিকে। বললেন, তুমি ওখানে চলে যাও, রাম। রাত আর বেশি বাকি নেই, আমি এখন জেগে আছি।

রামবাহাদুর মাথাটা একটু নিচু করলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে সেন্ট্রিরুমে বন্দুকটা রেখে এলো। দাশগুপ্ত দেখলেন, নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নায় একটা মানুষ ধীরে ধীরে গেট পেরিয়ে গেলো।

সকালবেলা গঙ্গা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো। সঙ্গে স্ত্রী শোভনা। বাইরে রোদ উঠেছে, চারদিক ঝকমক করছে। মেঘ কেটে যাওয়ায় আজকের সকালের শীতটা বেশ মিষ্টি লাগছে।

শোভনা বললেন, একটু আগে হরকা দুধ দিয়ে গেলো। ওর কাছে শুনলাম, কাল রাতে চারদিকে ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটে গেছে।

কি রকম? কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

চারদিকে শুধু ধস্ আর ধস্। আমাদের এ বাড়ির নিচের দিকেও নাকি ধস নেমেছে, য়ুক্যালিপটাস গাছ দুটো হেলে পড়েছে।

তাই নাকি? দাশগুপ্ত হঠাৎ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলেন : য়ুক্যালিপটাস গাছ দুটো গেলো?

দাশগুপ্ত উঠে পড়লেন। গাড়ি-বারান্দার ছাদে এসে দাঁড়ালেন, য়ুক্যালিপটাস গাছ দুটো দেখতে চেষ্টা করলেন। শোভনা সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই গাছ দুটো আমার কতো প্রিয় ছিল, তুমি জান। সত্যি গাছ দুটো হেলে আছে।

শোভনা এতে দুঃখিত হয়েছেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন : হরকা বলছিল, নিচের ওদিকে পি ডব্লু, ডি-র বড়বাবুর বাড়ির একটা অংশও বসে গেছে। ওরা ভয় পেয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

দাশগুপ্ত উত্তরে কোনো কথা বললেন না। কাল রাতে তিনি এই ছাদে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক অস্পষ্ট মায়াময় বলে মনে হচ্ছিলো। এখন সকাল, শরতের রোদে চারদিক ঝলমল করছে। কাছের ঘরবাড়ি, মাঠ, ক্ষেত, দূরের গাছপালা, আরও দূরের বনভূমি এখন অত্যন্ত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। দুর্পিণ পাহাড়ের বৌদ্ধ গুম্ফা, সেখানে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা মন্ত্রলেখা যে কাপড়ের নিশানগুলো দেখে কাল রাতে তাঁর একরকম ভয়ের

অনুভব হয়েছিল, এখন সেগুলো স্থিরভাবে রোদ পোহাচ্ছে যেন। এখন হাওয়ায় কোনো বেগ নেই, নিশানগুলো কাঁপছে না ; সৈন্য-দের ছাউনীর সবুজ রঙের ছাদগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

চমৎকার কাঞ্চনজঙ্ঘা ; নীল কুয়াশার পাৎলা আস্তরণে ঢাকা দূরের পাহাড়, পেশক চা বাগানের গাছগুলো ঘন সবুজ, টাইগার হিলের টাওয়ারটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশের নিচে ডাউ-হিলের বন, আরেকদিকে কাফের পাহাড়ের অরণ্যভূমি।

সত্যি কাফের পাহাড়ের বিরাট অংশ ধসে পড়েছে। এই সূর্যের আলোতে সেখানকার লালমাটি একটা বড় ক্ষতের মতো ধক্ ধক্ করছে। দাশগুপ্ত শোভনাকে সেদিকটা দেখিয়ে বললেন, ওই ধসটা দ্যাখো, ভাগ্যিস ওখানে কোন লোকজন থাকে না, তাহলে কি হতো ভাবা যায় না।

শোভনা কাফের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বোধহয় আতংকিত হলেন, বললেন, এসব দেখে আমার এ-বাড়িতে থাকতেও এখন ভয় করছে। চারদিকে মাটি ভিজে, এই বাড়িটা কখন ধসে পড়ে কে জানে।

দাশগুপ্ত হাসলেন : এই বাড়ির মত বাড়ি কালিম্পঙে কটা আছে আর যে তুমি ভয় পাচ্ছ ?

কি জানি, শোভনা বললেন : চারদিক দেখেশুনে ভরসার কিছুও দেখি না। চলো, ঘরে চলো, তোমার খাবার পড়ে রয়েছে।

খাবার খেতে খেতে দাশগুপ্ত বললেন, আমি একটু বেরোব। গঙ্গাকে দিয়ে কালুকে খবর দাও।

কালু অপিসের ড্রাইভার।

কালু ? কালুকে দিয়ে কি হবে ? শোভনা অবাক হয়ে বললেন, চারধারে যা অবস্থা তাতে কি রাস্তাঘাট আর গাড়ি চলার মতো আছে ? যদি যেতে হয় তবে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।

কথাটা ঠিক। দাশগুপ্ত অভ্যাসের বশেই কথাটা বলেছিলেন,

এখন ভুল বুঝতে পারলেন। শোভনা ঠিকই বলেছেন, যেতে হলে হেঁটেই যেতে হবে। অথচ এই অবস্থায় ঘরে বসে থাকা মানায় না।

তিনি একবার ডায়াল করলেন সোমনাথকে। সোমনাথ রায়, এখানকার এস. ডি. ও, অল্প বয়স, তার অমায়িক ব্যবহারে সবার প্রিয়। তার কাছ থেকে দুর্যোগের প্রকৃতিটা একবার জেনে নিতে চাইলেন তিনি। কিন্তু টেলিফোনে কোন শব্দ নেই, মনে হলো যেন লাইনটা 'ডেড্'। তবু আরেকবার তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারও কোনো সাড়া নেই। অর্থাৎ কোথাও তার ছিঁড়েছে বা পোস্ট ভেঙে গেছে; তিনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

বাইরে প্রখর রোদ, দাশগুপ্ত শোভনার কাছে ছাতা চাইলেন। টেবিল থেকে তুলে নিলেন রোদ-চশমা। শোভনা ছাতা নিয়ে এসে বললেন, আমার ফিরতে দেরি হতে পারে, আমার জন্যে অপেক্ষা না করে তোমরা খেয়ে নিয়ো।

কেন? তুমি কি শহর অবধি যাবে নাকি?

নিশ্চয়ই। দাশগুপ্ত জুতোর ফিতে ঠিক করতে করতে বললেন, এই অবস্থায় ঘরে বসে থাকা আমাকে মানায় না অন্তত।

শোভনা এর কোন উত্তর দিলেন না। দাশগুপ্ত বললেন, মনে হচ্ছে অফিসে আজ আর কেউ আসবে না। অসীম ছুটিতে গেছে জলপাইগুড়ি। শিবকুমার যদি আসে ওকে থাকতে বোলো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দাশগুপ্ত প্রথমে অশোকদের বাড়ির দিকে চললেন। পাঁচ মিনিটের পথ, কিন্তু একটু এগিয়েই দেখলেন একটা মস্ত পাইনগাছ পড়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আর কাদা-মাটি ও পাথরের জন্যও সেই পথে যাওয়া অসম্ভব। তিনি অগত্যা তাঁর ড্রাইভারের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে পাকদণ্ডী বেয়ে এগিয়ে গেলেন। ভেজা, পিছল পথ, মাটির ভেতর থেকে এখানে-ওখানে

সব সময়েই জলের ধারা কোনো গোপন উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে। ছাতা দিয়ে কোনোরকমে শরীরের তার ঠিক রেখে তিনি অশোকদের বাড়ির কাছে পৌঁছলেন। দেখলেন আট দশজন লোক, বেলচা কোদাল হাতে, পরিশ্রান্ত মুখে একপাশে বসে বিশ্রাম করছে। দাশগুপ্তকে দেখে ওরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো।

সামনেই পাঁচটি মৃতদেহ পরপর শোয়ানো, অশোকের বাবা, মা, দুটি বোন আর এক বছরের একটি ছোট্ট ভাই। একটু দূরে তিনটি গরু আর একটি ছাগল পড়ে আছে ; তারই পাশে একটা কুকুর, মৃত্যুতেও যে প্রভুর পরিণামকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে।

এই মৃতদেহ, বেলচা কোদাল হাতে স্তব্ধ কতগুলো লোক, বিহ্বল অশ্রুহীনতা,—সব মিলিয়ে একটা নৈসর্গিক ছবির মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু এই ছবি কে আঁকলো ? কে সেই অপার্থিব শিল্পী, যার হাত এমন অনিবার্য ও নিষ্ঠুর ? সে কি দাশগুপ্তকে দেখাবে বলেই এই ছবি এঁকেছিল ? রাতের অন্ধকারে ঘুমের কুঠরী ভেদ করে সেই কি কাল রাতে হানা দিয়েছিল তাঁর চৈতন্যের ভেতরে ?

এরা কাল বেঁচেছিল। অসুখ নয়, বিসুখ নয়, জীবনের স্বাভাবিক আবর্তনে নয়, হঠাৎ একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদ্যত আক্রমণে এরা আজ আর কেউ নেই। অথচ এরা কাল বেঁচেছিল। এরা কাল বেঁচেছিল—দাশগুপ্তর মনে হলো তিনি স্তব্ধতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন। চমকে উঠতে গিয়ে এক পাশে রামবাহাদুরের দিকে চোখ পড়তেই তিনি নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেন।

রামবাহাদুর, তাঁর অফিসের নাইট গার্ড। স্বজনের দুর্যোগের কথা জেনেও যে নীরবে তার কর্তব্য করে যায়। দাশগুপ্ত তাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

রামবাহাদুর কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, অশোককে পাওয়া গেছে ?

নেহি, সাব।

ছিব-বস্তীর হিম্বল কে?

রামবাহাদুর হিম্বলকে কাছে ডাকলো।

হিম্বলকে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খবর পেলে কেমন করে?

ভীমবাহাদুর আমাদের প্রথম খবর দেয়, সাব।

কিভাবে এরকম হলো, তুমি জানো?

ভীমবাহাদুর ভালো জানে, সাব।

অশোকদের বাড়ির পাশে ভীম বাহাদুর থাকে। বাইরে অন্ধকার আর বৃষ্টিতে একটা আতঙ্ক, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে তারা সবাই শুয়েছিল। চোখে ঘুম নেই, কখন কি হয়। পাহাড়ের জীবনে তাদের এইরকম রাত অনেক সময়েই আসে। বাইরে হাওয়ার শব্দ, মেঘের শব্দ, কোথাও কোনো অঘটন যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এই আশংকার মধ্যে তারা একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলো, একবার মনে হলো যেন সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠলো। কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে গেলো, তারা বুঝতে পারলো। তবু ওই অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা কেউ বাইরে এলো না। বৃষ্টিতে মাটি আলগা হয়ে আছে, কখন কোথা থেকে ঝরে পড়ে কাকে চাপা দিয়ে যায় তার ঠিক নেই। পরদিন সকালে সব খোঁজখবর নেওয়া যাবে, এই মনে করে তারা আর ঘরের বাইরে আসেনি।

এই অস্বস্তি আর আতঙ্কের মধ্যেই হয়তো একসময় তাদের তন্দ্রা এসে থাকবে, কিন্তু ঘরের দরজায় প্রায় আর্তনাদের মতো নাম ধরে ডাক শুনে ভীমবাহাদুর চমকে উঠে পড়লো। দরজা খুলতেই অশোক। বাইরে বৃষ্টি ছিল না, জ্যোৎস্নায় চারদিক ছেয়ে আছে। সেই আলোয় অশোককে উদভ্রান্ত দেখালো, সে প্রায় চিৎকার করে কাঁদছিলো।

অশোককে ভীমবাহাদুর ঘরের মধ্যে টেনে নিলো। ঘরের সবাই

এর মধ্যে উঠে বসেছে। অশোককে দেখে কারো বুঝতে বাকি রইলো না দুর্ঘটনা কোথায় ঘটেছে।

অশোকদের বাড়িতেও সেদিন কেউ ঘুমোতে পারছিলো না। সেই আতঙ্ক, কখন কোথায় কি অঘটন ঘটে। অশোক একটা স্কুলে পড়ে, সামনে এ্যান্নুয়েল পরীক্ষা, বারান্দার ঘরে বসে সে পড়ছিলো। ভিতরের দিকে ঘরে আর সব জেগে বসে আছে, একটি বোন আর ছোট্ট ভাইটা সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়েছিলো। এমনি এক সময় হঠাৎ পিছন দিককার গৌরীকুঞ্জের পাহাড়ের একটা বড় অংশ ধ্বসে পড়লো তাদের বাড়ির ওপর। পলকের জন্যে একটা চিৎকার শুনেছিল অশোক, কিন্তু ঘর ভেঙে পড়েছে এই বিভীষিকায় সে বারান্দার ঘর থেকে এক লাফে বাইরে চলে আসে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিলো অঝোরে, পিছন দিক থেকে ছুটে আসা জল-কাদার ধাক্কায় সে ছিটকে গিয়ে পড়লো নিচের পি. ডব্লু. ডি-র রাস্তায়। চারদিক অন্ধকার, প্রবল বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। কোনোরকমে জল কাদার মধ্য থেকে সে নিজেকে তুলে ধরেই পাশের একটা জেকারেণ্ডা গাছে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। সেখান থেকে সে প্রাণপণে চিৎকার করে, কিন্তু ওই ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে সব হারিয়ে যায়।

ভীমবাহাদুর বললো, অশোকের কাছ থেকে সব শুনে কাছাকাছি আরো লোকজন নিয়ে তক্ষুণি আমরা বেলচা কোদাল খন্তা হাতে এখানে ছুটে আসি, সাব। সবার পিছনে গোয়ালঘর ছিল, প্রথমে সেখানে খুঁড়ে তিনটে গরু আর একটা ছাগল মরা পেয়েছি। তারপর ওদের ঘর খুঁড়তে এদের সব পেলাম। সাব, এখন কি হবে ?

দাশগুপ্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, আগে একজন গিয়ে থানায় খবর দাও। তারপর মৃতদেহগুলো সংকার করে ফেলো। আমি শহরে যাচ্ছি, এস. ডি ও. সাহেবকে এ ঘটনার কথা আমি বলব, তিনি যদি কোন সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন।

ভীমবাহাদুর উত্তরে মাথা নাড়ালো।

দাশগুপ্ত বললেন, তোমরা এরপর অশোককে খোঁজ কর। ও ছাড়া পরিবারের আর কেউ তো বেঁচে নেই।

মৃতদেহগুলোর কাছে বসেছিলেন এক বৃদ্ধা। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

ভীমবাহাদুর বললো, অশোকের দিদিমা।

শহরে যাবার সোজা পথ বন্ধ দাশগুপ্ত আশ্রমের পথ ধরে চলছিলেন। 'আমরা কি রকম অসহায়তার মধ্যে বেঁচে আছি' এই রকম একটা বোধে তাঁর ভিতরটা বার বার মোচড় দিয়ে উঠছিলো। অশোকদের বিধ্বস্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে রাত শেষের সেই নির্জন ডাকটা বার বার তাঁকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। 'অশোক'—ছিব বস্তির হিম্বল বাহাদুরের সেই প্রতিকারহীন ডাক, দাশগুপ্তের মনে হচ্ছে, এই জীবন ভিতরটাকেও যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো।

সব কুশল তো দাশগুপ্তবাবু ?—আশ্রমের গেটে স্মিত মুখে স্বামিজী দাঁড়িয়েছিলেন। দাশগুপ্তর অন্যমনস্কতা ছিঁড়ে গেলো।

কুশল। আপনার কুশল তো ?

হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

শহরে। বড় রাস্তা ধসে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্বামিজী গেট খুলে একটু এগিয়ে এলেন কাছে।

তাই এই পথে আজ লোকজনের ভিড় দেখছি। ওরাও ধসের কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। খুব বড় রকমের কিছু হয়েছে কি ? আপনি জানেন ?

শুনতে পাচ্ছি খুব বড় রকমের কিছু হয়েছে। তাই শহরে যাচ্ছি।

স্বামিজীকে হঠাৎ বিভ্রান্ত দেখালো।

কিন্তু আমাদের আশ্রমে তো আর কেউ নেই। আমি একা থাকি, আপনি জানেন। এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি ?

কোন অপরাধবোধ? হতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি? দাশগুপ্ত যেন নিজেকেই পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন। এই যে আমি অশোকদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কতগুলি অসহায় মৃত্যু দেখে এলাম, এই যে মৃতদেহগুলি ঘিরে অশোকের বৃদ্ধা দিদিমার বুক ফাটা কান্না শুনে এলাম, আমি সেখানে কি করেছি? এই যে আমি শহরে যাচ্ছি, অনেক শোকচিহ্নের সংবাদ-স্তূপের মুখোমুখি, সেখানে আমি কি করতে পারি? আমি বেলচা কোদাল হাতে ধ্বংসের পুঞ্জ খুঁড়তে পারি না, কবর খুঁড়তে পারি না যাতে মৃত্যুকে চাপা দেওয়া যায়, গাড়ির পথ বন্ধ বলে শহর অবধি হেঁটে যেতে হলে আমার কষ্ট হয়, হাতে ছাতা না থাকলে প্রাণান্ত-কর মনে হয় সূর্যের উজ্জ্বলতা। তবু তো যাচ্ছি শুধু যেতে হয় বলে? সহানুভূতি? সবার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানোর কৃতার্থতার বোধ? নাকি সবটাই নিছক সামাজিকতা?

হায় সামাজিকতা! একটা আত্মগ্লানির মধ্যে পথের বাঁক নিতেই মুখোমুখি পুলকেশ।

আশ্রমকে পিছনে রেখে খানিকটা নিচে নেমে এসেছিলেন দাশগুপ্ত। না, স্বামিজীকে তিনি কোনোরকমে আর বিব্রত করেন নি। আমাদের সত্যি আর কি করবার আছে? এই বলে তাঁর কাছ থেকে তিনি বিদায় নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এই সময় পুলকেশ।

এই যে দাদা, শহরে তো? পুলকেশ তার স্বাভাবিক হল্লোড়ে গলায় বললো, খবর তাহলে এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন!

তা কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছি বলতে পারো, কিন্তু তুমি এসময় এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

সর্বনাশের কথা আর বলবেন না দাদা, পুলকেশের উচ্চ কণ্ঠঃ একটা খবর পেলাম, তিস্তা ব্রীজটা নাকি বন্যায় ভেসে গেছে।

তিস্তা ব্রীজ? বলো কি? এ কি সম্ভব?

আমিও তো বিশ্বাস করতে পারছি না, পুলকেশ তার হাতের শক্ত

মজবুত ক্যান্টিলিভার ব্রীজ, একশ' বছরের মধ্যে যার রিপেয়ারের প্রয়োজনের কথা নয়, সেটা কি করে ভেসে গেল আমি বুঝতে পারছি না।'

পুলকেশ এখানকার সরকারী এঞ্জিনীয়র। কর্মঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ, আমুদে, আর চিৎকার না করে সে কথা বলতে পারে না। তার হাতে শক্ত একটা লাঠি, গলায় ঝোলানো বাইনাকুলার। দাশগুপ্তর চোখ সেদিকে পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তা বাইনাকুলার নিয়ে এদিকে যাচ্ছ কোথায় ?'

'ওই তো দাদা, কথাটা শুনে অবধি ঠিক থাকতে পারছি না। একটা লোক অবশ্য পাঠিয়েছি, খবরটা সত্যি কিনা দেখে আসতে। কিন্তু রাস্তাঘাটের যে অবস্থা লোকটা সেখানে পৌঁছতে পারবে কিনা তার ঠিক নেই। তাই নিজেই চলেছি ছুপিণের দিকে, ওখান থেকে বাইনাকলার দিয়ে দেখব ব্রীজটা আছে কি নেই '

'তোমার কি মনে হয়, ব্রীজটা কি আছে ?'

পুলকেশ রাস্তার পাশে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লো। গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে দূরে তিস্তা উপত্যকার দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো বোধহয়। দাশগুপ্তর দিকে না তাকিয়েই আস্তে আস্তে বললো, 'বোধহয় নেই।'

'এর অর্থ বুঝতে পারছ পুলকেশ' ? দাশগুপ্ত একটু উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'ওই ব্রীজটাই এখানকার একমাত্র লাইফ-লাইন। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। আমরা এখন একেবারে বিচ্ছিন্ন, কতটা অসহায় বুঝতে পারছ ?'

পুলকেশ বোধহয় ব্রীজটার কথাই ভাবছিল। বললো, 'সাতভোরে এস. ডি. ও. সাহেব থানায় ডেকে পাঠান আমাকে। গিয়ে শুনি, ব্রীজটা ভেঙে পড়তে পারে এই রকম একটা খবর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের গেজ-রীডার কাল প্রথম রাতেই টেলিফোন করে থানায় জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ; গেজ-রীডিং পোষ্টে তার পক্ষে তখন

আর থাকা নিরাপদ নয়, যে কোন সময় অফিসঘরটা নদীতে ধ্বসে পড়তে পারে। বড় বড় গাছ আপ-স্ট্রীম থেকে তিস্তায় ভেসে আসছে, ব্রীজটার গায়ে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিচ্ছে। অনেকগাছ আটকেও গেছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে ব্রীজটা অক্ষত থাকা কঠিন। এরপর তিস্তাবাজার থেকে আর কোন সংবাদ আসেনি, থানা থেকে বার বার চেষ্টা করেও গেজ রীডারকে পাওয়া যায়নি। বোধহয় সে নিরাপদ কোন জায়গায় সরে গেছে। এরপর কি আর ওটা আছে বলে মনে হয় দাদা?'

পুলকেশ যেন একটা রিপোর্ট দিয়ে গেল, দাশগুপ্ত শুনলেন। কথা শেষ করে পুলকেশ উঠে পড়লো, 'জানেন দাদা লাইফ-লাইনের ব্যাপারটা আমি অত ভাবি না। পি-ডব্লু-ডি আছে, আর্মি আছে, একটা ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। কি ওই ব্রীজটা, এমন একটা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কীল, ভেসে গেলো, একথা ভাবতেই খুব কষ্ট হয়, কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।'

পুলকেশ এঞ্জিনীয়র। দাশগুপ্ত মুগ্ধ হয়ে এঞ্জিনীয়রের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করলেন। বললেন, 'তুমি যাও পুলকেশ, আমি তোমার সেন্টিমেণ্ট বুঝতে পারছি। দেখে এসো ব্রীজটা আছে কি নেই।'

পুলকেশ ওপরের দিকে উঠে গেলো, দাশগুপ্ত নিচের দিকে এগোলেন শহরের পথে। পুলকেশের কথা থেকে বোঝা গেলো সোমনাথ সকাল হতেই থানায় গিয়ে পৌঁছেছে। সে এখানকার এস. ডি. ও., তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। অল্প বয়স হলেও কাজের প্রতি নিষ্ঠায় ও তার অমায়িক ব্যবহারে সে এখানকার সবার প্রিয়। এই দুর্যোগে সোমনাথ সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এটা ভাবতে দাশগুপ্তর ভালো লাগলো। শহরের মাঝখানে থানা, কাজেই শহরে গেলেই সোমনাথের সঙ্গে দেখা হবে, সেখানে ইতিমধ্যে নানা জায়গার খবর এসে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। অশোকদের বাড়ি কিভাবে চূর্ণ হয়ে গেলো তিনি দেখেছেন, সে প্রবলতা তিস্তা ব্রীজ ভাসিয়ে নিয়ে

যেতে পারে, তার বীভৎসতো তিনি আন্দাজ করতে পারেন। কাজেই শহরে গিয়ে তিনি যা দেখবেন বা শুনবেন তার ভয়াবহতার কথা ভাবতে গিয়ে দাশগুপ্ত নিজের মধ্যে একবার শীত অনুভব করলেন।

অথচ সকালের উষ্ণ রোদে প্রকৃতি এখন গরীয়ান। সামনের উপত্যকার গাছপালা, বন-উপবন, একটা কি দুটো বস্তী, তার চালা-ঘরগুলি সমস্তই সূর্যের আলোয় চমৎকার লাগছে। পাহাড় ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে তিস্তার কিছুটা ওপরে তাসিডিং বনাঞ্চলের সঙ্গে মিশে গেছে। বনের মাথায় পাৎলা কুয়াশার একটা আস্তরণ, চলাচলহীন ও স্তব্ধ, একরাশ মূর্চ্ছার মত। মনে হয়, সৌন্দর্য সেন তার উন্মীলিত রূপ নিয়ে রৌদ্রস্নান করছে।

কিন্তু দাশগুপ্ত বেশি দূর এগোতে পারলেন না, পথে বাধা পড়লো। সামনেই ওপর থেকে মাটি-পাথর পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। একটা বিরাট শিরীশ গাছ কাৎ হয়ে কোনোরকমে যেন ঝুলে আছে রাস্তার ওপর। এই মাটি পাথরের ঢিবি পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। দাশগুপ্ত ডানদিকের জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, একটা পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন আছে সেখানে। কিন্তু পাথরটা ভেজা এবং পিছল। অনেকটা বাধ্য হয়েই ছাতায় ভর দিয়ে তিনি সেই পথে উঠতে চেষ্টা করলেন, এ ছাড়া রাস্তায় বাধা পেরনোর কোন উপায় নেই।

পায়ে-হাঁটা পথটা পাইনের ঝাড়ের পাশ দিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। পাইন গাছগুলোর গোড়ায় এসে দাশগুপ্ত একবার দাঁড়ালেন। এখান থেকে পিচের রাস্তায় নামবার কোন পথ নেই, নামতে গেলে তাঁকে নিজের পথ করে নামতে হবে। অস্বস্তি ও বিরক্তি দুইই তাঁকে একবার দ্বিধাগ্রস্ত করলো। পাইনের ছায়ায় তিনি কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন।

এবং এই সময় তিনি সেই দৃশ্য দেখলেন। পঞ্চাশ ষাট ফুট সামনে নিচের দিকে একটা বস্তী চূর্ণ হয়ে গেছে। খড়ে ছাওয়া ঘরগুলি সব মাটির নিচে চাপা পড়েছে, কোথাও হয়তো চালের এক সামান্য অংশ

ধসের মধ্য থেকে কোনোরকমে মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে আছে, অসহায়ের মত নিদারুণ যন্ত্রণায় মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। একমাত্র রামপ্রসাদ ছেত্রীর পাকা বাড়িটা জ্যান্ত কবরের ওপর একটা সাদা ক্রশ-চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। তবু একটু ভালো করে দেখতেই দাশগুপ্ত বুঝতে পারলেন, ওই বাড়িটাও সম্পূর্ণ অক্ষত নেই, তার একটা অংশ ধসে পড়েছে।

রামপ্রসাদ ছেত্রী সরকারী চাকুরে ছিলেন। বছর কয়েক আগে দাশগুপ্ত যখন শিলিগুড়িতে পোষ্টেড, ছেত্রীও সেখানে কাজ করতেন। সেখানেই দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। অবসর নিয়ে সেখান থেকে ছেত্রী চলে আসেন কালিম্পঙে, ছোট একটা বাড়ি বানিয়ে এখানেই বসবাস করেন। দাশগুপ্ত যখন পরে এখানে বদলি হয়ে এলেন, তিনি খুঁজে নিলেন বয়সী বন্ধুকে, পুরনো সম্পর্কের ধারাটাকে শুখোতে দিলেন না। ছেত্রীর একটি ছেলে, কলকাতায় থাকে ; এখানে তিনি সস্ত্রীক প্রায় একা জীবন-যাপন করছেন।

সম্ভবতঃ একা থাকেন, এই কারণেই তিনি বাড়ির নিচের অংশটা ভাড়া দিয়েছিলেন। এখানকার স্কুলে ছেলেবেলায় জিৎবাহাদুর এক সঙ্গে পড়তো ; তার ছেলে হেমকুমার তামাঙ এখন মোটর ড্রাইভারি করে। গাড়ি নিয়ে প্রায়ই তাকে এদিক ওদিক চলে যেতে হয়, বুড়ো মা-বাবাকে একা থাকতে হয়। হেমকুমার একদিন বলতেই ছেত্রী তাঁর বাড়ির নিচের অংশটা ওদের ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যান নামমাত্র ভাড়ায়। তিনি নিজে একা থাকেন, পুরনো বন্ধু জিৎবাহাদুরও একা থাকে প্রায়ই ; বুড়ো বয়সে পাশাপাশি পরস্পর থাকা যাবে, এই ভেবেই তিনি সম্ভবতঃ হেমকুমারকে নিচের অংশটা সহজেই দিয়েছিলেন।

দূর থেকে দাশগুপ্তর মনে হলো, ছেত্রীর বাড়ির সেই নিচের অংশটাই ধসে গেছে, যেটা হেমকুমার ভাড়া নিয়েছিল। হেমকুমারের

বাবা জিৎবাহাদুরের বৃদ্ধ মুখটা তাঁর মনে পড়লো। ছেত্রীর বাড়িতে অনেকসময় জিৎবাহাদুর এসে তাঁদের গল্পে যোগ দিতেন। একটু ক্লান্ত মুখ তাঁর, মুখের চামড়া কোঁচকানো, প্রায়ই দাড়ি কামান না; দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে একটা কষ্টসাধ্য জীবনের কাছে ওই কর্সা মুখটা ধীরে ধীরে হেরে গেছে

তাহলে জিৎবাহাদুর? নাকি ছেত্রীও? ভাবতেই দাশগুপ্তর অস্বস্তিটা তীব্র হয়ে উঠলো। তিনি শহরে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন; কিন্তু চোখের ওপর ছেত্রীর বাড়িটা অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, এই অবস্থায় একবার সেখানে না গেলে নিজের কাছেই কোনো জবাবদিহি থাকে না। এখান থেকে বড় রাস্তায় নেমে যাবার কোনো পথ নেই, দাশগুপ্ত অগত্যা পাইনের গুঁড়ি আর বনঝাড়ের শিকড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিজের পথ নিজেই বানিয়ে নিলেন, বড় রাস্তায় যখন নেমে এলেন তখন তিনি অনভ্যাসের দায়ে অবসন্ন, তবু নিরাপদ বলে ভিতরে ভিতরে খুশি।

ধীরে ধীরে তিনি ছেত্রীর বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। বসবার ঘরের দরজা খোলা, ভিতরে লোক আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি একটু ঘুরে ধীর পায়ে ডানদিকে এলেন, দেখলেন নিচের দিকে যে বস্তিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেখানে কিছু লোক জড় হয়ে নিচুস্বরে কথাবার্তা বলছে আর কিছু লোক বেলচা-কোদাল হাতে ধসের মাটি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছে। পাহাড়ের একটা আড়াল ছিল বলে ওপর থেকে তিনি সবটা স্পষ্ট দেখতে পাননি।

কাজ অনেক নিচুতে হচ্ছে, এবং সেখানে যাবার কোনো সহজ, নিরাপদ রাস্তা নেই। দূর থেকেই সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন দাশগুপ্ত। ওপরে আকাশ আর সূর্যকে সাক্ষী রেখে কতগুলো মানুষ কবর খুঁড়ে প্রাণের সন্ধান করছে। পৃথিবীতে এই রকম কত না বিষম আছে।

দাশগুপ্ত সেখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। ছেত্রীর মূল বাড়িটার দিকে ফিরে আসতে গিয়ে তাঁর বাড়ির নিচের দিককার দু'খানা ঘরের পরিণতি দেখলেন। মূল বাড়ি থেকে ওই অংশটি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে তলিয়ে গেছে, আর ছেত্রীর ঘরখানাও বিপজ্জনকভাবে জমিটার একটা ধারে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। ঐ ধারটা পাথর-সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে না তুললে আগামী বর্ষায় সমস্ত বাড়িটাই ধসে যাবে।

দাশগুপ্ত ছেত্রীর বসবার ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, ঘরের এক কোণে একটা সোফায় ছেত্রী চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। দেখেই মনে হলো অনেক চিন্তার ভিড়ে চিন্তাহীনতার শূন্যতায় তিনি আচ্ছন্ন। বাইরের কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো চৈতন্য আছে বলে মনে হয় না। সব নিশ্চুপ, বাড়ির ভেতর থেকেও কোনো সাড়া-শব্দ আসছে না। মিনিটখানেক ঐভাবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে দাশগুপ্ত অনির্দিষ্টভাবে গলায় একটা শব্দ তুললেন, এইভাবেই তাঁর উপস্থিতির কথাটা যেন তিনি জানিয়ে দিতে চান। এতে কাজও হলো। ঐ শব্দে ছেত্রী একবার চোখ মেলে তাকালেন। কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি। ইশারায় তিনি দাশগুপ্তকে ভিতরে আসতে বলে আবার চোখ বুজলেন। যেন তাকিয়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

দাশগুপ্ত ছেত্রীর মুখোমুখি আর একখানা সোফায় বসলেন। একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সব কিছুই আগের মতো আছে, সাজানো গোছানো ঘর, গৃহিণীর যত্নের পরিচয় চারধারে। কেবল ফুলদানীগুলোতে বাসি ফুল ফেলে দিয়ে নতুন ফুল রাখা হয়নি। এখানে এলেই ছেত্রীর স্ত্রী হাসিমুখে এগিয়ে আসেন, নমস্কার করে অভ্যর্থনা করেন, আজ তাঁকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দাশগুপ্ত একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

একটু চুপ করে থেকে দাশগুপ্ত অগত্যা ডাকলেন, 'ছেত্রীসাহেব'—

ছেত্রী চোখ মেললেন।

'বড্ড ক্লান্ত। দাশগুপ্ত সাহেব, আমি যেন কিছু ভাবতে পারছি না আর।'

এই কথার উত্তরে দাশগুপ্তর কিছু বলার ছিল না।

একটু পরে ছেত্রীই আবার কথা বললেন।

'গিন্নি বাড়ি নেই, দাশগুপ্ত সাহেব, আপনাকে বোধহয় এখন চা দিতে পারব না, কিছু মনে করবেন না।'

দাশগুপ্ত এই কথায় বিব্রত বোধ করলেন। এই বোধহয় পাহাড়ের শক্ত মাটির কোমল উপহার, ভদ্রতার এই আন্তরিক পরিচয় নানা জায়গায় তিনি এর আগেও অনেকবার পেয়েছেন। বললেন, 'এ নিয়ে আপনি ভাববেন না ছেত্রী সাহেব, এই কি চা খাবার সময়? কিন্তু আপনার স্ত্রী তো বাইরে বেশি যান না।'

'ঠিকই বলেছেন, তিনি ঘরের কাজ নিয়ে ঘরে থাকতেই ভালো-বাসেন,' ছেত্রী ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমিও বারণ করেছিলাম যেতে, কিন্তু তিনি শুনলেন না। সেই সাতভোরে আমাকে এককাপ চা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, নিচে ধসের ওখানে যে কাজ হচ্ছে সেখানে। এখনো ফেরেননি।'

দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন; জানালেন যে ধসের ওখানে কোদাল বেলচা নিয়ে যে কাজ হচ্ছে তিনি তা দেখেছেন।

ছেত্রী বললেন, 'আমারও হয়তো যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে জোর পেলাম না। তা ছাড়া কি হবে আর ওখানে গিয়ে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতগুলো লাশ দেখা এতে আমার কোনো কর্তব্য করা হবে? যখন করবার, তখনই তো কিছু করতে পারলাম না। সেই অসহায়তা নিয়ে তাই চুপচাপ একা বসে আছি।'

ছেত্রীর সত্যিই কি কিছু করবার ছিল?

কদিনের টানা দুর্যোগ কাল রাতে যেন পণ করে নেমেছিল সারা উপত্যকা জুড়ে। তখন রাত দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। এক

অনেক আগেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী শুয়ে পড়েছিলেন। মনে সব সময়েই একটা আতঙ্ক ছিল; পাহাড়ে যাঁরা থাকেন, এই রকমের দুর্যোগে এই আতঙ্কের হাত ধরেই তাঁদের থাকতে হয়। ঘুম আসছিল না; ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রাও মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠলো। তাড়াতাড়ি বেড-সুইচটা টিপলেন, কিন্তু আলো জ্বললো না। বালিশের পাশ থেকে টর্চ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন বাইরে, তখনও অঝোর বৃষ্টি পড়ছে। ঘোর অন্ধকার, দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তক্ষুণি ঘরের ভেতরে ফিরে এসে জানালা দিয়ে কাছের থেকে নিচের দিকে দেখতে চেষ্টা করলেন। টর্চের আলো ফেললেন, দেখলেন তাঁরই বাড়ির নিচের অংশটা জল-কাদার স্রোতে নেমে যাচ্ছে।

আর সেই মুহূর্তে সেই চিৎকার।

-রামপ্রসাদ --

সেই চেনা গলা ভয়ে আতঙ্কে অচেনার মত শোনাচ্ছে। জিৎ-বাহাদুর।

— রামপ্রসাদ—

আর্ত চিৎকারের ধ্বনি তাহলে এরকম হয়? বরফের চেয়ে এত ঠাণ্ডা?

কিন্তু কি করবেন রামপ্রসাদ ছেত্রী? একবার চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করলেন, 'জিৎ—,' কিন্তু গলায় কোনো স্বর এলো না। হাতে টর্চের আলো জ্বলছিল, ওই আলো দেখেই বোধহয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জীবনের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলেন: 'ডুবি', ডুবি'।

দড়ি চাই। জলকাদার স্রোতে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে দড়ি পেলে তা ধরে ধরে ওপরে উঠে আসতে পারবে। পাগলের মতো ঘরের এদিক ওদিকে দড়ি খুঁজলেন ছেত্রী, কিন্তু কোথাও এক টুকরো দড়ি পাওয়া গেল না। এদিকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে বাইরের আর্তধ্বনি, বৃষ্টির

শব্দের সঙ্গে কে কোন্ ধ্বনি মুছে দেবে, তার প্রতিযোগিতা চলছে যেন।

মেয়েদের উপস্থিত বুদ্ধি হয়তো একটু বেশি। ছেত্রী-গিন্নিও তাঁর সঙ্গে দড়ি খুঁজছিলেন, কিন্তু দড়ি না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়ে ওই অন্ধকারের মধ্যেই দুটো তিনটে শাড়ি গেরো দিয়ে নিয়ে এলেন মুহূর্তে. জানালা দিয়ে একটা দিক বাইরে ফেলে দিয়ে অন্যদিক জোর করে ধরে রাখলেন, ছেত্রী শাড়ির রেখায় টর্চের আলোটা ধরলেন। চিৎকার করে বললেন. 'জিৎ, ডুরি।'

কিন্তু বৃষ্টি সেই শব্দ মুছে দিল শাড়ির প্রান্তরেখা ভিজে কাদা-মাটিতে নেতিয়ে পড়ল। শাড়ির ওই প্রান্ত ধরে কেউ উঠে এলো না।

এরপর সারারাত 'রামপ্রসাদ'। বৃষ্টিতে শুধুই 'রামপ্রসাদ.' বৃষ্টি থেমে গেলে নিষ্ঠুর জ্যোৎস্নায়ও সেই 'রামপ্রসাদ'। কেউ ডাকছে? রামপ্রসাদ জীবনের আরেক নাম হয়ে গিয়েছিল সেই রাতে।

সেই থেকে তাঁর বাইরের ঘরে একা বসে আছেন রামপ্রসাদ ছেত্রী। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের কাজে লোকজন নেমে গেছে, ছেত্রী বসে আছেন তাঁর ঘরে।

দাশগুপ্ত বললেন. 'জিৎবাহাদুরের ছেলে বাড়ি ছিল না?'

'না', ছেত্রী ক্লান্ত গলায় বললেন. 'হেমকুমার গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি গেছে। ওর কাছে আমার কোনো উত্তর নেই।'

শহরের পথে বেরিয়েছিলেন দাশগুপ্ত, মাঝে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। ছেত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি থানার দিকে চললেন। দে-সরকারের কাছে আগেই খবর পেয়েছিলেন, সোমনাথ থানায় আছে।

থানাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে। দাশগুপ্ত কাছে এসে দেখলেন, চার-দিকে চেনা-অচেনা লোকের ভিড়. কোথাও কোথাও জটলা। কেউ উঁচু গলায় কথা বলছে, কেউ স্তব্ধ মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সরকারী কর্মচারীরা ব্যস্ত, ছুটোছুটি করছে তৎপরতার সঙ্গে। সেনা-

বাহিনীর কিছু লোককেও দেখা গেল। দাশগুপ্ত বুঝতে পারলেন, সোমনাথ রিলিফের কাজের বন্দোবস্ত প্রায় করে ফেলেছে।

সোমনাথ থানার বারান্দায় একটা চেয়ারে বসেছিল। দাশগুপ্তকে কাছে ডেকে বললো, 'আপনাকে আরও আগে আশা করেছিলাম দাদা। আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, অসময়ে আপনাদের পরামর্শ দরকার ছিল। যাইহোক, বসুন। দিলীপবাবু অবস্থাটা আপাতত সামলে নিয়েছেন কিছুটা।'

দাশগুপ্ত এই রোদে এতটা পথ হেঁটে এসে ঘামছিলেন। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসলেন। বারান্দার অন্যপ্রান্তে, দিলীপবাবু একটা কাগজ হাতে নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। দিলীপ গুহ এখানকার সেকেণ্ড অফিসার, প্রবীণ মানুষ, ধীর ও স্থির তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি। দাশগুপ্ত দেখলেন শহরের সরকারী কর্মচারীদের প্রায় প্রত্যেকেই এখানে উপস্থিত। বি. ডি. ও নারায়ণবাবু আর খাসমহল অফিসার একটা রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে কোন পরামর্শ করছে বোধহয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না ঠিক ঠিক লোক ঠিক সময়ে এক সঙ্গে কথা বলছে। নারায়ণবাবু বি. ডি ও, কাজেই রিলিফের কাজে তার অভিজ্ঞতা অনেক, আর খাসমহল অফিসার স্থানীয় লোক, নিম্মা শিরিং, কর্মঠ, সমস্ত মহকুমার বস্তী আর রাস্তাঘাট সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল।

দাশগুপ্ত দেখলেন এখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেন্টও আছে। সোমনাথের অনুযোগের তিনি কোনো উত্তর দেননি; সোমনাথের বয়স অল্প, সে প্রবীণের পরামর্শের জন্য তাকিয়ে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তার অনুযোগও তাই সঙ্গত। এইসব সময়ে সবারই কিছু করার থাকে না, অথবা কিছু যে করতে হবেই এমন কোনো কথাও নেই; কিন্তু একসঙ্গে হওয়ার মধ্য দিয়েই প্রত্যেক কর্মের অংশীদার হয়ে যায়। এর দামও কম নয়। দাশগুপ্ত সোমনাথের অনুযোগের তাই কোনো উত্তর দিলেন না।

থানার ভিতরে সেনাবাহিনীর কিছু লোক কথাবার্তা বলছিল, বারান্দায় বসেই তাদের দেখা যাচ্ছে। দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আর্মিকেও খবর দিয়েছ বোধহয়!'

'হ্যাঁ, দাদা,' সোমনাথ তার স্বভাব-সরলতায় উত্তর দিল, 'টেলিফোন ছিল না, তাই সাত সকালেই জি. ও. সি সূর্য সিং-এর কাছে চিঠি দিয়ে এক সিপাই পাঠিয়ে দিই সাহায্য চেয়ে। রাস্তাঘাট থেকে ধস পরিষ্কার করবার মতো যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে, তাছাড়া অভিজ্ঞতার অভাব তো আছেই। আর ডাক্তার, অন্তত ফার্স্ট এইডের সঙ্গে পরিচিত লোকজনও আমাদের কিছু নেই। মেজর জেনারেল সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি পাঠান। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হিম।'

'আর্মির লোকেরা তো এরই মধ্যে এসেও গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ব্রিগেডিয়ার চন্দ্রশেখর ইঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, অন্যান্য র‍্যাঙ্কের লোকজন, যন্ত্রপাতি অষুধপত্তর ইত্যাদি নিয়ে একটু আগেই এসে পৌঁছেছেন। এখন আমাদের রিলিফ স্কোয়াডগুলো বেরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

এই সময় দিলীপবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'স্যর, আমাদের সব তৈরী। স্কোয়াডগুলো এবার একে একে বেরিয়ে যাক্।'

'ফাইনাল অবস্থাটা কি দাঁড়াল?' সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলো।

'আমাদের মোট বারোটা স্কোয়াড হচ্ছে।' দিলীপবাবু বললেন, 'স্কোয়াড মাস্টার হচ্ছেন একজন গভর্নমেণ্ট অফিসার বা সিনিয়র সাব-ডিসেট। প্রত্যেক স্কোয়াডে থাকছে একজন ডাক্তার বা ফার্স্ট এইড জানা লোক, ইঞ্জিনীয়র একজন ও কিছু লোক যারা রাস্তার ধস পরিষ্কার করতে সাহায্য করতে পারে, আর একদল মজুর যারা সঙ্গে যাবে চাল-ডাল নিয়ে। স্কোয়াড মাস্টার অবস্থা অনুযায়ী রিলিফের ব্যবস্থা করবে।'

'ঠিক আছে।' সোমনাথ বললো, 'ওদের প্রসীড করতে বলুন।'

একে একে স্কোয়াডগুলো বেরিয়ে গেল। চারদিকের ভিড় ফাঁকা হয়ে এলো অনেকটা। থানা'র বারান্দায় বসে ক্লান্ত সোমনাথ দাশগুপ্তকে বললো, 'এবার একটু চা খাব। তারপর চলুন, কাছাকাছি একটু ঘুরে দেখে আসি। আপনার এক্ষুনি বাড়ি ফেরার তাড়া নেই তো দাদা?'

দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু যাবে কোথায়? আর যাবেই বা কি করে?'

'কেন, হেঁটে যাবো।' সোমনাথ তৎপর জবাব দিল, 'সেই সাত-ভোরে এসে এখানে বসে আছি, নানা খবর শুনছি, নিজের চোখে কিছুই দেখা হয়নি। একবার অন্তত দু'একটা স্পট্-এ যাওয়া দরকার।'

দাশগুপ্তের মুখ খুব মলিন দেখাচ্ছিল; বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার যাওয়া দরকার। কিন্তু সোমনাথ, গিয়ে কি দেখবে?' তাঁর গলা কথা বলতে বলতে ধরে আসছিল, 'সর্বত্র এক ছবি। ধস, মৃত্যু আর কান্না। আমি তো দেখে এলাম, কি অসহায় মানুষ, কিছু করবার নেই।'

সোমনাথ বাধা দিয়ে বললো, 'ওকথা বলবেন না দাদা। অসহায়-তার সময়েই তো সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। আসলে ওটাই কাজ। জানেন দাদা, এই যে রিলিফ স্কোয়াডগুলো বেরিয়ে গেল, এখন আমার মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। আমরা অন্তত কিছু কাজ করতে যাচ্ছি।'

এই সময় চা এলো। সঙ্গে থানার ইন্সপেক্টর হরিশ প্রধান।

'চা-টা খেয়ে নিন স্যর। তারপর বেরোবেন বলেছিলেন!'

'হ্যাঁ', সোমনাথ চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন, 'আপনি বসুন না। দাদা, আপনি চা টা খেয়ে নিন। আচ্ছা মিঃ প্রধান তোপখানার দিকেও তো ধস হয়েছে শোনা যাচ্ছে?'

'আজ্ঞে হাঁা, স্যর।'

'আমি তাহলে ওদিকটাতেই প্রথমে যাই। আপনি বরং আমার সঙ্গে ওয়াকিবহাল দু'জন সেপাই দিন।'

একটু ইতস্ততঃ করে ইন্সপেক্টর বললো, 'আপনি যদি বলেন, আমিই সঙ্গে যেতে পারি স্যর।'

'না, তার দরকার নেই।' চা খেতে খেতে সোমনাথ হরিশ প্রধানের দিকে সোজাসুজি তাকালেন, 'আপনাকে এখানে কয়েকটা জরুরি কাজ করতে হবে। এখানকার মার্চেন্টদের খাদ্যশস্যের গুদাম-গুলো সীল করে দেওয়া হয়েছে. বড় গুদামগুলোতে অন্তত পুলিশ পোষ্টিং করে দিন। এক কণা চাল-ডালও ওরা যেন সরাতে না পারে, ওদের বিশ্বাস নেই। আর আপনি নিজে পেট্রোল পাম্পগুলোতে গিয়ে পেট্রোলের ষ্টক নিন। আমার লিখিত অনুমতি ছাড়া এক লিটার পেট্রোলও যেন বিক্রি না হয়, তার ব্যবস্থা করুন।'

হরিশ প্রধান মাথা নাড়লেন।

দাশগুপ্ত বললেন, 'খাদ্য-শস্যের কথা বুঝি, কিন্তু পেট্রোল আটকে তুমি কি করবে? রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, তাতে পেট্রোল কিনবেই বা কে?'

সোমনাথের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সে একটু হাসল, বললো, 'এখন কেউ কিনবে না ঠিকই, কিন্তু পরে লাগবে। রাস্তাঘাট একটু পরিষ্কার হলেই বোঝা যাবে এই ব্যবস্থাটা জরুরি ছিল। দাদা, আপনি মনে করেন এখানে যখন এই অবস্থা, নিচে তার অন্তত কিছুটা হয়নি? এই অবস্থায় নিচ থেকে পেট্রোলের রেগুলার সাপ্লাই-র ওপর আমি ভরসা করি কেমন করে?'

দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন, বোধহয় প্রবীণ-নবীনের বিচক্ষণতায় কিছুটা মুগ্ধও হলেন। তিনি চারধারের বিপর্যয়ে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন; এই সময়টা পথে বেশি করে তৎপর কাজ দাবি করে, সেই বোধটা তাঁর কাছে প্রায় আড়াল হয়ে গিয়েছিল। বাইরে প্রখর সূর্য, এই সময় চাই ধারালো কর্ম। সহায়তা। জীবনের দিক থেকে প্রসারিত প্রসন্ন হাত-মৃত্যুর আঘাতে গড়ে ওঠা ক্ষত চিহ্নগুলির দিকে। সোমনাথ। দাশগুপ্ত সোমনাথের দিকে একবার তাকালেন, তাঁর

দৃষ্টিতে প্রশংসা ছিল।

আজই সকালে শহরে আসবার জন্যে তিনি ড্রাইভারের খোঁজ করেছিলেন। ডেভেলপ্‌মেণ্ট এরিয়ার সেই প্রান্তশেষ থেকে শহর অনেক দূর, অভ্যাসের বশেই তিনি গাড়ির কথা ভেবেছিলেন। এই নিয়ে তাঁর মনে কি কোন লজ্জার বোধ এসেছিল? মিশনের সেই স্বামিজীর কথা মনে পড়লো। 'এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি।' অভ্যাসের আরাম দিয়ে একখানি ছোট্ট কুঠরি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, আমরা তার মধ্যে কখন বন্দী হয়ে যাই, নিজেরাই জানি না। বাইরের জানালা দিয়ে দেখা যায় আলো, তখন ঝলমলিয়ে ওঠে মনের আকাশ; কখনো মেঘ জল, আর আমরা জানালা বন্ধ করে দিই, অন্ধকার ঘরে বিষণ্ণতা ঘন হয়ে আসে। কখনো একটা মোটা সাপ ঘরের বাইরে দেখলেই বন্ধ করি ঘরের সমস্ত ছিদ্র, ঘরের মধ্যে দেখলে ভয়ে আতঙ্কে এক কোণে গুটিসুটি রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে বসে থাকি— যতক্ষণ না সে সরে যায়। আমাদের ভাবেও নিয়ন্ত্রিত অভ্যাস, আমাদের ভয়েও নিরুদ্যম সমর্পণ। দাশগুপ্তর কি কখনো লজ্জার বোধ হয়?

হয়তো।· হয়তো বা না। কিন্তু তিনি ধসে দুর্গম পথ ধরে শহরে নেমে এসেছেন। তাঁর ভিতর থেকেই আসবার তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। শুধু মেলানোর চেষ্টা, একসঙ্গে থাকার সামাজিক বোধ। কিন্তু সারা পথ ধরে তিনি কি দেখে এলেন? কোথাও মেলে? অশোকের দিদিমার কান্না এখনো কানে বাজে। অশোক কোথায়? ছেত্রী সেই রাত থেকে এই বেলা পর্যন্ত নিঃসাড় বসে আছেন কেন একা? মেলাতে পারেননি বলে?

'দাশগুপ্ত সাহেব, অদৃষ্ট মানেন?' ছেত্রী সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে। দাশগুপ্ত তার উত্তর দেননি।

ছেত্রীই তার উত্তর দিয়েছিলেন: 'আগে মানতাম না, এখন মানি। আপনি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? যুদ্ধ হয় সমানে সমানে!

বড়র সামনে না দাঁড়ালে নিজের ছোটত্ব বোঝা যায় না, জিৎবাহাদুর কাল রাতে সেই ভয়ঙ্কর বিরাটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। হেরে গেল। আমিও হারতাম।'

দাশগুপ্তর মনে হয়, তিনিও হারতেন। তাঁর লজ্জার বোধ, সোমনাথের উদ্যমের প্রখরতা একমুহূর্তে সব মানে হারিয়ে ফেলে। ছেত্রী সাহেবের কিছু হয়নি, কিন্তু কাল সারারাত ধরে তিনি গ্রীক ট্রাজিডির দৃশ্যাভিনয় দেখে গেছেন। তিনি কি শুদ্ধ চিত্তের অধিকার লাভ করেছেন?

ছেত্রীর শান্ত থমথমে মুখটা মনে এলো। সোমনাথের সঙ্গে দেখা হলে এই মুহূর্তে তিনি কি বলতেন? দাশগুপ্ত সোমনাথের দিকে তাকিয়ে-ছিলেন; তিনি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ছেত্রীসাহেব বলছেন, 'প্রসীড ইয়ংম্যান, গড্ ব্লেস য়্যু'।

সঙ্গে দু'জন সেপাই দিয়েছিল ইন্সপেক্টর হরিশ প্রধান। সোমনাথ আর দাশগুপ্ত তোপখানার দিকে যাচ্ছিলেন। সেপাইদের কাছেই শোনা গেল সেখানে একটা বস্তী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে; শোনা যাচ্ছে সেখানে অন্তত পনেরো জন লোক মাটি চাপা পড়েছে।

এই অঞ্চলটায় এক সময় ভুটান রাজার সামরিক ঘাটি ছিল বলে লোকশ্রুতি আছে। অন্তত একশ বছর আগে এখানে রাজার কামান বন্দুক আর গুলি-বারুদের গুদাম ছিল। সেই থেকে এখানকার নাম তোপখানা। একদল সৈন্য স্থায়ীভাবে এখানে বাস করত, সেজন্য একটা দুর্গও ছিল। কিন্তু আজ একশ বছর পর তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। সারা অঞ্চল জুড়ে ঘরবাড়ি তৈরী করে এখন লোকজন বসবাস করছে এখানে, কাজকর্ম করছে, কিছু কিছু চাষ আবাদও হচ্ছে।

জায়গাটা দুরধিগম্য নয়, বরং বড় রাস্তার ঠিক ওপরেই। বড়

রাস্তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি, ফলে তাঁদের সেখানে পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হলো না। সেখানে পৌঁছে সোমনাথ দেখলো রিলিফ স্কোয়াড সেখানে এরই মধ্যে এসে পৌঁছে গেছে।

সমস্ত বস্তীটা, গাছপালা বাড়িঘর সমেত, নিচে নেমে এসে রাস্তার ওপর পড়েছে, রাস্তা গড়িয়ে নিচের দিকে আরও খানিকটা নেমে এসে রাস্তার ওপর পড়েছে, রাস্তা গড়িয়ে নিচের দিকে আরও খানিকটা নেমে গেছে। স্থানীয় লোকেরা ইতিমধ্যে ধসের অনেকটা পরিষ্কার করে ফেলেছে, এখন পর্যন্ত ধসের নিচে থেকে পাওয়া মৃতদেহগুলি রাস্তার পাশে পর পর শুইয়ে রেখেছে। আরও কিছু লোক ধসে চাপা পড়ে আছে বলে এখনও মাটি খোঁড়ার কাজ চলছে। সোমনাথ দেখল স্থানীয় লোকদের সঙ্গে স্কোয়াডের লোকও বেলচা কোদাল হাতে কাজে নেমে পড়েছে।

সোমনাথকে দেখে স্কোয়াড মাস্টার তার কাছে এগিয়ে এলো, সঙ্গে স্থানীয় অঞ্চলের প্রধান নীলাম্বর গুরুং। কি ভাবে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে তার অনুমানের কথা তাকে জানালো গুরুং।

সোমনাথ জানতে চাইলো: 'কত লোক মারা গেছে বলে মনে করছেন?'

'দশটি লাশ পাওয়া গেছে,' গুরুং বললো, 'বস্তীর জনসংখ্যা হিসেব করে মনে হচ্ছে আরও চার-পাঁচজন মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে।'

সেপাইরা তাকে তাহলে মোটামুটি ঠিক খবরই দিয়েছে।

'আপনাদের এই পরিষ্কার করার কাজে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে মনে হয়। কিন্তু স্যার—'

সোমনাথ গুরুঙের দিকে তাকালো।

'বলুন।'

'সব পরিবারই সব হারিয়েছে। এদের নিয়ে কি করব?'

'কেন?' সোমনাথ তৎপর জবাব দিলো, 'রিলিফ স্কোয়াড আপনাদের এখানে তো পৌঁছে গেছে। আপনাদের কি কি প্রয়োজন হবে এদের বলুন, এরা যথাসাধ্য করবে।'

স্কোয়াড মাস্টার বললো, 'সেজন্যে ভাববেন না গুরুং সাহেব। তবে বুঝতেই পারছেন সাত তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই নিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি, ফলে কিছু অভাব আমাদের আছে। যেমন ধরুন আমাদের তাঁবু নেই, কম্বল খুবই কম; এই রকম আর কি।'

দাশগুপ্ত আগাগোড়া চুপচাপ দর্শক। তিনি ধ্বংসের দিকে চেয়ে দেখছিলেন শুধু। কালকের জীবন্ত বস্তী আজ স্তূপীকৃত শোক। পর পর কতগুলো মৃতদেহ রাস্তার পাশে শোয়ানো। জলকাদা আর রক্তে মাখা মৃতদেহ দেখতে এত বীভৎস হয়! এই মৃতদেহগুলো ঘিরে বসে আছে তাদের আত্মীয়রা, কান্নাকাটি করছে। কারো মা বেঁচে আছে হয়তো, ছেলে নেই, কোনো পরিবার নিশ্চিহ্ন, কোনো পরিবার হয়তো অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। দাশগুপ্ত জানেন না। চারদিকে কান্না আছে, কিন্তু চাপা, তেমন কোনো গোলমাল নেই কোথাও। যারা খুঁড়ছে, তারা মলিন মুখে কাজ করে যাচ্ছে, যারা তদারক করছে তারাও আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছে, শোকার্তদের যারা সান্ত্বনা দিচ্ছে তাদের গলাও নিচু। সমস্ত জায়গাটা যেন বিহ্বলতায় স্তব্ধ। কেবল এক বৃদ্ধা, দাশগুপ্ত দেখলেন, ধ্বংসস্তূপের চারদিকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিঃশব্দে বিড়বিড় করছে বা কখনো হঠাৎ চিৎকার করে উঠে দুহাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। কারো কাছে নালিশ?

'সোমনাথ,' দাশগুপ্ত একসময় বললেন, 'এর কোনো উত্তর জানা আছে?'

'আমাদের বোধহয় আরও দুয়েকটা স্পটে যাওয়া উচিত।' সোমনাথ উত্তর দিলো।

তোপখানা থেকে ওঁরা ভালুকোপের দিকে এগোলেন। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলেন না। পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দেখলেন এমন

সাংঘাতিক ধস নেমেছে যে বস্তির দিকে যাবার রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড় একেবারে খাড়া, জলকাদায় মাটি আলগা হয়ে আছে। সঙ্গের কনেস্টবলটি সবাইকে সাবধান করে দিলো, ওই পথে এগোনো মানেই বিপদ, অর্থাৎ মৃত্যু। একটা গাছে হাত রেখে সোমনাথ তবু একটু ঝুঁকি নিয়েই নিচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো। সেখানে একটা জলকাদার স্রোত অনেকটা জায়গা নিয়ে নদীর দিকে নেমে যাচ্ছে। দুচারটে কলাগাছ, একটা বাড়ির খড়ের চাল জল-কাদার স্রোতের ওপর দুমড়ে পড়ে আছে। ওখানে যে কখনো কোনো লোকালয় ছিল, তা বোঝবার কোনো উপায় নেই।

সব জায়গার ছবিই প্রায় এক। হেঁটে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সোমনাথ সম্ভবত একটু ক্লান্ত বোধ করছিলো ; সেই রাত শেষ থেকে প্রায় একটা ঘূর্ণির মধ্যে সে আছে, ক্লান্ত বোধ করা স্বাভাবিকও। সে একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসলো। দাশগুপ্তকে বললো, 'একটু বসেনি দাদা, এরপর যাব।'

দাশগুপ্ত বসলেন। রোদ চড়া, এরই মধ্যে ঝির ঝিরে হাওয়া আছে। শরীর জুড়িয়ে যায়। এখান থেকে সোজাসুজি তাকালে পেশকের হাওয়া ঘর অস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তার পেছনকার পাহাড়ের ছোট্ট সামান্য বাধা না থাকলে দেখা যেত দার্জিলিঙের পূর্বী মুখ। সোমনাথের দৃষ্টি হাওয়া ঘরের নিচে গিয়ে একবার নিবিষ্ট হলো। ওখানে ত্রিবেণী ; —তিস্তা আর রঙ্গীতের সঙ্গম। দাশগুপ্তকে বললো, 'এখান থেকে চমৎকার দেখাচ্ছে ত্রিবেণীকে, দেখুন।'

দাশগুপ্ত দেখলেন। এখানকার লোক ওই সঙ্গমকে 'বেণী' বলে। তিস্তা আর রঙ্গীত দুইই কি ভীষণভাবে ফেঁপে উঠেছে, এখান থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে।

সোমনাথ বললো, 'ওখানটায় আমার এখনো যাওয়া হয়নি। দেখি, এবারকার মেলায় যদি যেতে পারি। আপনি গেছেন ?'

দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন। প্রত্যেক বছর মাঘী সংক্রান্তিতে এই

ত্রিবেণী সঙ্গমে মেলা বসে। গত বছরও বসেছিল, এবারও হয়তো বসবে। দূর দূর গ্রাম বসতি থেকে পল্লী বধূরা নানারঙের শাড়ি পরে আসে, সঙ্গমে স্নান করে, পুজো দেয়, ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করে, তারপর আবার দিনের শেষে ঘরে ফিরে যায়। সমস্ত তটভূমি জুড়ে মেলা বসে, নানা জনে নানা পসরা সাজিয়ে দোকান পাতে। সার্কাস আসে, ছেলে-মেয়েরা সার্কাস দেখে। বড়রা পাঁপর ভাজা দিয়ে নিমকি চা খায়। পাহাড় অঞ্চলে সাধারণ লোকেরা চিনির বদলে লবন বা নিমক দিয়ে চা খায়।। গৃহবধূরা সংসারের প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিসপত্র কেনে, তারপর বেলা গড়িয়ে এলে যে যার ঘরের পথে পা বাড়ায়। ছেলে-মেয়েদের হাতে গ্যাসভরা উড়ন্ত বেলুন, বধূদের হাতে সামান্য জিনিস, আর গৃহকর্তার কোলে ছোট শিশুটি।

দাশগুপ্তর চোখে মেলার জীবন্ত একটা ছবি ভেসে উঠলো। ছবি ছাড়া আর কি। আজকের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে এর আর কোনো পরিচয় কি সম্ভব ?

সংশয় প্রকাশ করতেই সোমনাথ বললো, 'আমি ওসব ভাবি না, দাদা। এবার মেলায় আমার সঙ্গে আপনিও চলুন। দেখবেন, সব একই রকম হচ্ছে। জীবনের টানেই মেলা বসে।'

ওঁরা শহরে ফিরে এলেন। থানায় ঢুকতে গিয়ে দেখলেন বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে পুলকেশ চুপচাপ শুয়ে আছে। খোলা দূরবীনটা তার গলা থেকে ঝুলছে।

'খবর কি পুলকেশ ?' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দাশগুপ্ত বললেন, 'কি দেখে এলে ?'

পুলকেশের বোধহয় একটু তন্দ্রার মত এসেছিলো, দাশগুপ্তর গলায় সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

'জানেন দাদা, সত্যি ব্রীজটা ভেসে গেছে।' পুলকেশের গলায় উত্তেজনা : তুর্পিন দাড়া থেকে বায়নাকুলার দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জায়গাটা ফাঁকা, নদীর এপারে ওপারে কোনো যোগ নেই।'

'সত্যি তাহলে ব্রীজটা গেলো !' সোমনাথ ঠাণ্ডা গলায় কথাটা যেন নিজের কাছেই বলতে বলতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ; পুলকেশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'উত্তেজিত হয়ে কি হবে। আপনি বসুন। আর কি দেখলেন বলুন।'

পুলকেশ বললো, 'তিস্তাবাজারের দিকেও প্রচুর ধস নেমেছে দেখলাম। বাড়িঘর পড়ে গেছে, ডাক বাংলোর একটা দিকও নেমে গেছে বলে মনে হলো। সমস্ত জায়গাটা ডেজার্টেড. বায়নাকুলারে কোনো লোকজন চোখে পড়লো না। সারা দেশ থেকে এখন আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।'

'কি অসহায় অবস্থা ভাবো তো সোমনাথ।' দাশগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

'ব্রীজটা থাকলেই কি আপনার ওই অসহায় অবস্থা কেটে যেতো ?' সোমনাথ সোজাসুজি দাশগুপ্তর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখান থেকে তিস্তা পর্যন্ত যে কত ধস নেমেছে তার ঠিক নেই। রাস্তাও ভেঙেছে। এইসব পরিষ্কার করা, মেরামত করা সে এক বিরাট কাজ ; ওসব না হলে ব্রীজ থাকা না থাকা সমান কথা। তাছাড়া শুনেছি লিকোবীরএ পুরো এক মাইল রাস্তা তিস্তায় ভেঙে পড়েছে। তাহলে বুঝতে পারছেন তো, দাদা ?'

'এ অবস্থায় যোগাযোগের কি হবে ?'

'লাভার রাস্তাটা মেরামত করে ও পথেই যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ওই পথের কিছু খবর জানো ?'

'কিছু কিছু জানি বৈ কি, দাদা,' সোমনাথ দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসলো, 'ওখানেও অনেক জায়গাই ধুয়ে মুছে

গেছে, তবে আজ সকাল থেকেই মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। ওখানকার আর্মি ক্যাম্পের লোকেরাই এ কাজ করছে। এখানে ওরা ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছে।'

সবটাই বিবরণ। দাশগুপ্ত এই বিবরণেই খানিকটা স্বস্তি পেলেন। আর্মির লোকেরা কাজে লেগেছে যখন, তখন দু-একদিনের মধ্যেই যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। তখন বাইরে থেকে রিলিফও এসে যাবে। নইলে লোক্যাল স্টক আর কতটুকু? কয়েকদিনের মধ্যে সারা মহকুমা ক্ষুধায় ধুঁকবে।

তবু দাশগুপ্তের মনে হলো, আরও নিশ্চিত হওয়া দরকার। বললেন, 'আর্মির তো দুটো হেলিকপ্টার আছে বলে শুনেছি, জি. ও. সি-কে বলে রিলিফের জন্যে ও দুটো কাজে লাগানো যায় না?'

পুলকেশ বললো, 'কিন্তু আমি যতটা জানি ও দুটোর বেস শিলিগুড়িতে। এখানকার জি. ও. সি-র বোধহয় তার ওপর ডাইরেক্ট কন্ট্রোল নেই।'

'তাছাড়া ও দুটো আর্মির পেসেন্টদের বেস হস্‌পিটালে ট্রান্সফার করার কাজেই শুধু ওরা ব্যবহার করে।' সোমনাথ পুলকেশের কথার পিঠে বললো। 'তবু, বিকেলে জি. ও. সি আসছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখব। এটা কিন্তু আপনি ভালো পরামর্শ দিয়েছেন দাদা।'

এই সময় ইন্সপেক্টর হরিশ প্রধান এলেন।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, 'পেট্রলের স্টক-এ্যাকাউন্ট হলো?'

'হ্যা, স্যার,' হরিশ প্রধান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজ সোমনাথের দিকে এগিয়ে দিলো। সোমনাথ কাগজটা একবার দেখে ওর কাছেই ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'ওটা আপনার কাছেই রাখুন আপাতত। আর কি খবর-টবর পেলেন বলুন।'

'আপনারা তখন চলে যাবার পর ইরিগেশানের যুধিষ্ঠির লামা এসেছিলো।' ইন্সপেক্টর সোমনাথকে জানালো, 'ও কয়েকদিনের ছুটি চায়। ওর অফিসে এখন সবাই ছুটিতে, পুজোয় ও একাই আছে,

কাজেই আপনার কাছে এসেছিলো।'

'তা যেন বুঝলাম, কিন্তু এখানকার এ অবস্থায় তো ছুটি দেওয়া যায় না।'

'আমি তাকে সে কথা বলেছি। কিন্তু ওর-ও ছুটি চাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'কেন?'

প্রধান জানালো, যুধিষ্ঠির লামার বাড়ি এখান থেকে মাইল আঠারো দূরে লাভা পাহাড়ের এক বস্তিতে। মা বাবা ভাই বোন সকলেই আছে, কিন্তু সরকারী কাজের জন্য সে 'দশাই'-তে বাড়ি যেতে পারেনি। বাঙালি বাবুরা সব পুজোয় বাড়ি গেছে, সে অগত্যা একা অফিস আগলাচ্ছে। ভাই-টিকার সময় কয়েকদিনের জন্য ওকে ছেড়ে দেবে বলে ওর অফিসার আশ্বাস দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই দুর্যোগের পর বাড়ির খোঁজ না করে তার পক্ষে চুপচাপ থাকা অসম্ভব। তাই সে ছুটির জন্য এসেছিলো।

সোমনাথ একটু চুপ করে থেকে বললো, 'ওকে বাড়ি যেতে বলুন। আপনি ওকে চেনেন তো?'

'হ্যাঁ স্যর।'

'সব ভালো থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন ফিরে আসে। একটা দরখাস্ত যেন আপনার কাছে রেখে যায়।'

পুলকেশ এই সময় বলে উঠলো, 'প্রধান সাহেব, একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না?'

'অবশ্য যায়,' প্রধান হেসে ফেললেন, 'শহরের রাস্তাঘাট নইলে কি আর ঠিক হবে? আমি দেখছি।'

সোমনাথও প্রায় হেসে ফেললো। প্রধান চলে গেলে বললো, 'প্রধান ভালো কথা বলেছেন। এবার আপনি চটপট শহরের রাস্তা নিয়ে লেগে যান পুলকেশবাবু। আর্মির লোকেরাও বলছিলো।'

'কুলি মজুররা সব রিলিফের কাজে চলে গেছে একটু মুস্কিল হবে।'

পুলকেশ সোমনাথকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'তা হলেও আমি চেষ্টা করছি। পরশু নাগাদ যাতে মোটামুটি গাড়ি চলতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু স্যর, তাতে তো ট্যুরিষ্টদের সমস্যা মিটবে না।'

ট্যুরিষ্টরা কি বলছে?'

'এক দলের সঙ্গে এখানে আসবার পথে দেখা হলো। ওরা আপনার খোঁজে থানায় এসেছিলো।'

'কিন্তু আমি এক্ষুণি ওদের জন্য কি করতে পারি?'

পুলকেশ এর উত্তর দিল না।

দাশগুপ্ত বললেন, 'তোমার পক্ষে এই সময় কিছু করার নেই তো বটেই। তবু একবার ওদের সমস্যাটা শুনে নিতে পারো। কিছু হোক না হোক এতে ওদের অন্তত মানসিক একটা রিলিফ হতে পারে।'

সোমনাথ কিছু বললো না। এক কনেষ্টবল্ ট্রেতে করে কয়েক কাপ চা নিয়ে এলো।

পুলকেশ চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলো, 'ইন্সপেক্টর এলেন না?'

হরিশ প্রধান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হলো। সে-ও এক কাপ চা তুলে নিয়ে বললো, 'পুলকেশবাবু কিছু বলছিলেন?'

'হ্যা', পুলকেশ একটু থেমে চায়ে চুমুক দিয়ে নিল, 'ট্যুরিষ্টদের সঙ্গে স্যরের কিভাবে দেখা হতে পারে?'

'আমি কয়েকটা হোটেলে খবর দিয়ে একটা সময় বলে দিতে পারি।

'থাক্', সোমনাথ বাধা দিলো, 'ওসব ইণ্টারভিউ, ডেপুটেশান আর ভালো লাগে না। আমি ফেরার পথে তিস্তা ভিউতে একবার খবর নিয়ে যাবো। আপনি কি বলেন দাদা?'

সোমনাথ দাশগুপ্তর দিকে তাকালো।

দাশগুপ্ত বললেন, 'সেই ভালো।'

অনেক বেলা হয়ে গেছে। সেই ভোর না হতে সোমনাথ থানায়

এসেছে, এখন স্নান, খাওয়া-দাওয়া একটু বিশ্রাম দরকার। সে বাড়ির পথে পা বাড়ালো। সঙ্গে দাশগুপ্ত। একই পথে দাশগুপ্তকেও বাড়ি ফিরতে হবে। প্রধান থানায় থেকে গেলো, পুলকেশের বাসাও থানার কাছে, সে-ও আর এলো না।

সোমনাথদের ফেরার পথেই তিস্তা ভিউ হোটেল। এখানকার মাপে হোটেলটা বেশ বড়, এবং বাঙালি ট্যুরিস্টদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। হোটেলের মালিক গোপাল পালের অমায়িক ব্যবহারের জন্যই এমনটা হয়েছে।

দরজার মুখে সোমনাথকে দেখে অফিস ঘর থেকে গোপাল পাল প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো।

'স্যর, আপনি! আসুন, আসুন'

অফিস ঘরে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সোমনাথ।

'বলুন, আপনার অবস্থা কি? আপনার বোর্ডারদের?'

'অবস্থার কথা আর কি বলব স্যর, তবে সপ্তাহখানেক ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে পারব।' গোপাল পাল নিজের অবস্থাটা জানালো, তারপর গলাটা একটু নিচু করে বললো, 'কিন্তু বোর্ডারদের অনেকেরই টাকা পয়সার টানাটানি, এই অবস্থায় পড়ে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে।'

'তা তো হতেই পারে।' সোমনাথ বললো, 'ওদের এখানে ডাকুন, প্রবলেমটা শুনে যাই।'

গোপাল পাল সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল একটু পরে কয়েকজন বোর্ডার এসে উপস্থিত হলো। সোমনাথ বললো, 'শুনলাম কিছু ট্যুরিষ্ট থানায় গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। শুনে আমি নিজেই এই হোটেলে এলাম। আপনারাও তো ট্যুরিষ্ট?'

'ট্যুরিষ্টও বলতে পারেন, আবার আপনাদের সরকারী বিজ্ঞাপনের শিকারও বলতে পারেন।' বিকাশ বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, 'কোন্‌টা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এখনো।'

গোপাল পাল এস.ডি.ও-র সামনে প্রায় আত্মরক্ষার জন্যেই বাধা দিলো, 'এ আপনার রাগের কথা বিকাশবাবু। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর কি কারো হাত আছে?'

'সে কথা কি আমরা বলেছি? আর দুর্যোগ আমাদের ছুঁলো কতটুকু? আপনার হোটেলটা তো দিব্যি বেঁচে আছে।' বিকাশ প্রায় ক্ষিপ্ত, 'আপনার বাগানে গ্লাডুলি আছে, সামনের বাড়িটার গাছে ম্যাগ্নোলিয়া আছে, চারধারে সোনালী রোদ, বেগুনি মৌমাছি, স্নো রেঞ্জ—'

'আঃ, কি হচ্ছে,' আরেকজন বোর্ডারই বিকাশকে বাধা দিয়ে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি এসব কথায় কিছু মনে করবেন না। আমাদের মানসিক অবস্থা তো বুঝতে পারছেন। আমাদের অনেকেরই অর্থ সঙ্গতি কম, আর কয়েকদিন থাকতে হলে আমাদের রাস্তায় থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না। আমাদের এক্ষুণি অন্তত শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাবার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।'

সোমনাথ ধীর গলায় বললো, 'আপনাদের অবস্থা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আপনাদের স্তোক দিয়ে লাভ নেই। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা তাতে এখন আমরা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন বলতে পারেন। তিস্তা ব্রীজ নেই, ও পথ বন্ধ; লাভা-নিম্বং-বাগরাকোট হয়ে শিলিগুড়ির কাঁচা পথে আছে একটা, ও পথে আপনাদের পায়ে হেঁটে যাওয়া এই অবস্থায় অসম্ভব; বাকী থাকে যে লাভা-গরু বাথান-শিলিগুড়ির পথ, সেটাও এখন অনুপযুক্ত, তবে মেরামতির কাজ আজই শুরু হয়েছে, কবে চলা-চলের উপযুক্ত হবে জানি না। কাজেই এই অবস্থায় আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়!'

বোর্ডাররা কেউ কোন কথা বললো না।

সোমনাথ উঠে পড়লো। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনাদের

এইটুকু, বলতে পারি, প্রথম সুযোগে আপনাদের শিলিগুড়ি পাঠাবার চেষ্টা আমি করব।'

দাশগুপ্ত বাড়ি ফিরে এলেন। গোপাল পালের হোটেলে বিকাশ ছেলেটিকে তাঁর ভালো লেগেছে। সে কথাগুলো খুবই ঝাঁঝালো বলেছে বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না! এই রকম আত্মীয় বন্ধুহীন জায়গায় অসহায় অবস্থায় পড়লে ওসব কথা সহজেই আসতে পারে। তার এই স্বাভাবিক আচরণটাই দাশগুপ্তর ভালো লেগেছে।

অফিসে আজ কোনো লোক আসেনি, আসা সম্ভবও নয়। এই দুর্ঘটনায় কর্মচারীদের নিজস্ব কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন অনেকেরই অনেকরকম অনিষ্ট হয়ে থাকতে পারে। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবোধ, বন্ধুতার বন্ধন বা রক্তের টান তাদের বোধহয় কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত করে রেখেছে। শুধু ওয়্যারলেশের রামকুমার বাবু এসেছেন। তিনি বিহারের লোক, অফিসের কাছেই কোয়ার্টার তাঁর। শাক্যকুমার প্রধান কাল রাতে ডিউটি করেছেন, আজকের দিনের বেলার ডিউটি রামকুমার বাবুর। দাশগুপ্ত রামকুমার বাবুর কাছে খবর নিয়ে জানলেন, কোথাও থেকে কোনো জরুরি খবর এখন পর্যন্ত আসেনি।

দাশগুপ্ত একতলার অফিস থেকে দোতলার কোয়ার্টারে উঠে এলেন। সেই সকালবেলা বেরিয়েছেন, প্রখর রোদে এতটা পথ হেঁটেছেন, নানা দুর্যোগের চেহারা দেখেছেন, এখন ক্লান্ত। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে এখন একটু বিশ্রাম নেবেন। তারপর আরেকবার শহরে যাবেন ; সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে হবে। এই রকম বিধ্বস্ত পথ ঘাট, আলো নেই কোথাও, কাজেই অন্ধকার নামবার আগে ফিরে আসাটা খুবই জরুরি।

শোভনা কথাটা শুনেই বাধা দিলেন, 'বিকেলে আবার শহরে যাবার

কি হলো ? তোমার কি করার আছে ওখানে ? তাছাড়া এই তো সেই ভোরে বেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে ফিরলে।'

খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। দাশগুপ্ত জলের গ্লাশটা নামিয়ে রাখলেন। খোলা জানালা দিয়ে কার্শিয়াঙ ডিভিশানের বনভূমি দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য তিস্তা থেকে উঠে আসছে সামান্য হাওয়া। ঘরে রোদ ছড়িয়ে আছে। শেষ দুপুরের রোদ। একটু জ্বালা আছে।

দাশগুপ্ত কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লেন। বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর দরজার কাছে ইজিচেয়ারে এসে বসলেন।

শোভনা বললেন, 'এখানে বসলে যে ! একটু শুয়ে নাও।'

দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন ; 'শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব। তার চেয়ে এখানে বসেই একটু বিশ্রাম করে নিই।'

শোভনা বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন।

দাশগুপ্ত মাথা না ফিরিয়েই বললেন. 'উঠলে যখন একটা পোষ্ট কার্ড নিয়ে এসো। অরুণকে একটা চিঠি লিখে দাও।'

শোভনা দরজার মুখে দাঁড়ালেন : 'চিঠি লিখে কি হবে, ডাক চলছে না কি ?'

'না, তা নয়। বিকেলে আর্মির কারো কাছে দিয়ে দেব, ওদের তো হেলিকপ্টারে চলাচল আছে। শিলিগুড়িতে যদি পোষ্ট করে দেয় নইলে মেয়েটা খুব চিন্তা করবে।'

শোভনা চলে গেলেন।

অরুণ, অরুন্ধতী, দাশগুপ্তদের একমাত্র মেয়ে। জলপাইগুড়ির এক টি ম্যাগনেটের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছেন। এখানকার এই দুর্যোগের খবরে তাঁর অস্থির হওয়া খুব স্বাভাবিক। ওর কাছে যেমন করেই হোক একটা নিরাপত্তার খবর পাঠানো জরুরি। ব্যক্তিগত কারণে তিনি সরকারী ওয়্যারলেস ব্যবহার করতে চান না।

একটু পরে শোভনা পোষ্ট কার্ড নিয়ে এ ঘরে এলেন। তিনি মধ্যে চিঠি লিখে এনেছেন। দাশগুপ্ত একবার চিঠিটা পড়ে

নিলেন। তারপর উঠলেন।

'এবার বেরিয়ে পড়ি, বিকেলে জি ও সি-র থানায় আসবার কথা আছে। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। আমি সন্ধ্যায় সন্ধ্যেয় ফিরে আসব।'

দাশগুপ্ত আবার শহরের পথে পা বাড়ালেন।

থানার দিকে যেতে পথে তিস্তা ভিউ হোটেল। দাশগুপ্ত দেখলেন, হোটেলের অফিস ঘরে বেশ কিছু লোকের জটলা কাচের জানালা দিয়ে গোপাল পাল-কে দেখা যাচ্ছে তার চেয়ারে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও বেলার সেই উত্তেজিত ছেলেটি। বিকাশ।

একটু কৌতূহলী হয়েই দাশগুপ্ত গোপাল পালের অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই গোপালবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন; 'আসুন আসুন দাশগুপ্ত সাহেব, বসুন। এরা সবাই মিলে একটা ভীষণ ব্যাপার করতে যাচ্ছে।'

'কি রকম?' দাশগুপ্ত একটা চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন। দেখলেন, সমবেতরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে; অর্থাৎ চিনতে পেরেছে। সোমনাথের সঙ্গে তিনি কিছু আগে এসেছিলেন, এবং নিশ্চয় সরকারী লোক। কেমন যেন একটা সন্দেহের দৃষ্টি তাদের চোখে।

দাশগুপ্তের ভালো লাগলো না, কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতে চাইলেন না। গোপালবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি রকমের ব্যাপার, গোপালবাবু?'

বিকাশ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল; গোপালবাবু কিছু বলবার আগে সে বলে উঠলো 'ব্যাপার কিছু গোপনীয় নয়। আপনারা তো সোজা-সুজি কিছু করতে পারবেন না বলে গেলেন, তাই আমাদেরই ফেরার একটা কিছু ব্যবস্থার কথা ভাবতে হলো।'

বিকাশের কথার ঝাঁঝে দাশগুপ্ত একটু হাসলেন: 'সে তো খুব ভাল কথা। ফেরার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন?'

আমরা 'হেঁটে ফিরব।'

সে কি! দাশগুপ্ত প্রায় আঁৎকে উঠলেন, 'যুদ্ধের সময় লোকেরা বার্মা থেকে হেঁটে ফিরেছেন শুনেছি! কিন্তু পথ চেনেন?'

'আমরা লামা-র সঙ্গে যাবো।'

'লামা?'

গোপালবাবু বললো, 'ওরা যুধিষ্ঠির লামার কথা বলছেন। যুধিষ্ঠির আমার এখানে পার্মানেন্ট বোর্ডার তো, ওঁদের সঙ্গে তার বেশ পরিচয় হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠির কাল বাড়ি যাবে, লাভা পর্যন্ত সে-ই ওঁদের গাইড হবে।'

ইরিগেশনের যুধিষ্ঠির লামার কথা আজকেই দাশগুপ্ত শুনেছেন। নিশ্চয়ই চেনেন, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছেন না মুখটা।

এই সময় যুধিষ্ঠির এলো। সঙ্গে এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা। যুধিষ্ঠির দাশগুপ্তকে দেখেই বললো, 'দাশগুপ্ত সাহেব, ভালো?'

এই যুধিষ্ঠির। দাশগুপ্ত তাকে চেনেন। ছোট শহর, ঘুরে ফিরে সকলের সঙ্গেই চেনা জানা হতে বাধ্য কোনো না কোনো রকমে। কিন্তু তিনি নাম আর মুখ কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না এতক্ষণ। এবার মিললেন।

'এস ডি. ও তো তোমার ছুটি মঞ্জুর করেছেন। কবে যাচ্ছ?'

'কাল ভোরে। এরাও কেউ কেউ সঙ্গে যাবেন।'

'তাই তো শুনলাম। এতো বেশ একটা অভিযানের মতো।'

'প্রায়,' যুধিষ্ঠির একটু হাসলো: 'আমিই বললাম, বসে থেকে কি হবে, চলুন আমার সঙ্গে। চেষ্টা করে দেখুন।'

'কিন্তু তুমি তো লাভা পর্যন্ত, তারপর ওরা যাবেন কেমন করে?'

'ও একটা হয়েই যাবে।' যুধিষ্ঠির কিছু বলবার আগে আরেকজন বলে উঠলো, 'কিন্তু লামা সাহেব, তুমি এই মহিলাকে নিয়ে এসেছ কেন? উনিও কি যাবেন?'

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এই মহিলা এই মাত্র এসেছে। একটু হেসে যুধিষ্ঠির বললো, 'যাবার ইচ্ছে বলে সবার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।' তারপর দাশগুপ্তর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের সেরিকালচারের অভয়বাবুর দাদা আর ভাবী অভয়বাবু আমার কাছে প্রস্তাব শুনেই বললেন ওর ভাবী এতে ইন্টারেস্টেড হতে পারেন। খবর পাঠালেন বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে হাসব্যাণ্ডকে নিয়ে আমার অফিসে এসে হাজির। আপনি বলুন মিসেস ব্যানার্জি—'

'ইট্‌স্ এ ফাইন গেম্, আই' 'ইল্ গো।'

'মিসেস ব্যানার্জি হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুরু করতেই বাধা পেলেন।

'রেণু না?'

'বিকাশ? তুই এখানে কোত্থেকে? কি আশ্চর্য, কতদিন পর দেখা বল্ তো?'

মিসেস ব্যানার্জি বলতে বলতে বিকাশের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলেন। সকলে ওদের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু রেণু ব্যানার্জির সেদিকে লক্ষ্য ছিলো না।

'কি মজা। কি করছিস এখন? ঠিক চিনতে পেরেছিস তো আমাকে।' প্রায় একসঙ্গে অনেকগুলো কথা সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে বলতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো: 'এই শুনছ? এদিকে এসো, এই আমাদের বিকাশ; কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম; ওর কথা তোমাকে কতবার বলেছি, মনে আছে?'

মিস্টার ব্যানার্জি এগিয়ে এলেন।

'মিট্ মাই হাজব্যাণ্ড্।'

ওরা পরস্পর নমস্কার করলো। বিকাশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো: 'তুই একটুও বদলাসনি। তোর ইংরেজি বুকনি শুনেই বুঝতে পারছি।'

'ঠাট্টা?'

সকলেই ওদের দেখছিল। হয়তো ওদের কথা উপভোগও করছিল। মিস্টার ব্যানার্জি সেটা লক্ষ্য করে বললেন: 'তোমাদের ঝগড়াটা আমরা পরে দেখব, আগে কাজের কথা—'

বিকাশ বাধা দিয়ে বললো, 'বলেন কি মিস্টার ব্যানার্জি, ঝগড়টাই তো আগে। ও স্কুল কলেজে বরাবর স্পোর্টসে ফার্স্ট হতো বলেই হাঁটা পথে শিলিগুড়ি যাবে, এ-কথা কোথায় লেখা আছে?'

মিস্টার ব্যানার্জি কিছু বলার আগে রেণু হেসে ফেললো: 'তুই অবাক করলি বিকাশ। চিরটা কাল বই নিয়ে কাটালি, কোনদিন এক মাইল হেঁটে দেখেছিস মানুষ কেমন করে চলে? তুই, যাই বলিস, বড্ড বেশি সাহস দেখাচ্ছিস।'

বিকাশ একটু থমকালো, তারপর বললো, 'শাস্ত্রে আছে, পথে ঘাটে মেয়েদের নিতে নেই। একেই দুঃসাহসিক একটা কাজ করতে যাচ্ছি আমরা, নানারকমের বিপদ হতে পারে, এই অবস্থায় তোকে সঙ্গে নিয়ে কি বিপদ বাড়াতে বলিস?'

'আমি কিছুই বলি না। মোট কথা, আমরাও যাব, যখন সুযোগ পেয়েছি। ইট্‌স্ এ ফাইন গেম।'

দাশগুপ্ত রেণুকে দেখছিলেন। বাঙালি মেয়েদের এইরকম উৎসাহ দেখে তাঁর ভালো লাগছিলো। সকলের সঙ্গে তিনি এতক্ষণ সবটা দেখছিলেন, এখন কথা বলতে ইচ্ছে হলো। বিকাশকে বললেন, 'দেখুন বিকাশবাবু, মিসেস ব্যানার্জিকে বাধা দেবেন না। ওঁর স্পিরিটটা বড় সুন্দর।' তারপর লামার দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে তোমরা কাল ভোরেই রওনা হচ্ছ যুধিষ্ঠির?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাশগুপ্ত সাহেব। বাড়ির জন্য খুবই চিন্তা।'

'ফিরে এসে ভালো খবর দিও।' দাশগুপ্ত তারপর বিকাশের দিকে তাকালেন, 'বিকাশবাবু, জায়গামত পৌঁছে আমাদের এখানে একটা চিঠি দেবেন কিন্তু আমরা সবাই খারাপ লোক নই, আমাদেরও কিন্তু আপনাদের জন্য ভাবনা হতে পারে।'

দাশগুপ্ত আর শহর অবধি গেলেন না। এখন শেষ দুপুর, বাড়ি ফিরে গিয়ে এখন তিনি বিশ্রাম করবেন। বয়েস হয়েছে, হাঁটাহাটি করবার বিশেষ অভ্যাস নেই, ফলে তাঁর একটু পরিশ্রমের বোধ হচ্ছে। মেয়েকে লেখা চিঠিটা পকেটে রইলো, কালকে চেষ্টা করা যাবে যদি কিছু করা যায়। জি. ও. সি বিকেলের দিকে আসবেন জানিয়েছিলেন, কিন্তু আসবেন তার ঠিক নেই; অনির্দিষ্টভাবে থানায় গিয়ে অপেক্ষা করতে এখন তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল না।

দাশগুপ্ত বাড়ি ফিরে এলেন। চড়াই আর শেষ দুপুরের প্রবল রোদ ভেঙে আসতে গিয়ে তিনি প্রায় ঘেমে নেয়ে উঠলেন। রেলি নদীর দিকে জানালাটা খুলে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন।

শোভনা এসে বললেন, 'একটু সরবৎ করে দেবো?'

দাশগুপ্ত বললেন, 'না। বরং একটু কফি করে দাও।'

শোভনা চলে গেলে দাশগুপ্ত চোখ বুজলেন। রেলি নদীর দিক থেকে যে পুবান বাতাস আসছিল, তাতে জুড়িয়ে গেলো সমস্ত ক্লান্তি। তিনি ঠিক কিছুই ভাবছিলেন না, তবু এরই মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে কতগুলি ধ্বংসস্তূপের ছবি অন্ধকার চোখের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল। বার বার অন্যমনস্কভাবে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন: কালকের দিনটি গত হয়েছে, আজকের দিনটিতে তাঁরা বেঁচে আছেন। কাল রাতে দেখা সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, সেই বিষাক্ত অনুভূতির কথা; সমস্তটা আশ্চর্য রকমের দুঃস্বপ্ন বলে মনে স্বস্তি বোধ করেন।

শোভনা কফি নিয়ে এলেন।

কাপে চুমুক দিয়ে দাশগুপ্ত বললেন, 'কিছু বলবে?'

শোভনার মুখে কিছু একটা বলবার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছিলেন দাশগুপ্ত।

শোভনা বললেন, 'তুমি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই হরকা এসেছিল।'

'হঠাৎ এ সময়? নিশ্চয় আবার কোন দুর্ঘটনার খবর? এ-সব

নিয়ে ওরা খুব মজা পাচ্ছে দেখছি।'

'মজা? কি ছাইভস্ম বলো।' শোভনা প্রায় প্রতিবাদের মতো করে বললেন, 'হরকা উমাশঙ্করবাবুর খবর?' দাশগুপ্ত প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন নিজেকে, কফির কাপটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন পাশের টেবিলে, এবং শোভনার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'উমাশঙ্করজীও রেহাই পাননি তাহলে?'

'না, না,' শোভনা তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিলেন, 'উমাশঙ্করজীর কিছু হয়নি, ওঁর জামাই নিখোঁজ হয়েছে।'

'জামাই? মানে রত্না ওরা এখানে?'

'হ্যাঁ, দশাইতে এসেছিল।'

দাশগুপ্ত আর কোন প্রশ্ন করলেন না। শুধু মনে পড়ল, একদিন সকালে একবাক্স মিষ্টি নিয়ে উমাশঙ্কর দাশগুপ্তর কাছে এসেছিলেন; 'আমার রত্নার বিয়ে, ভাবীজীকে নিয়ে আপনাকে যেতে হবে।'— হাত ধরে বলেছিলেন। শোভনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দাশগুপ্ত; অনাড়ম্বর আন্তরিক সেই অনুষ্ঠানে কোথায় যেন একটা শ্রী ছিল, কল্যাণ ছিল।

উমাশঙ্কর এই অঞ্চলের অতি শ্রদ্ধেয় মানুষ। ওঁর বাবা নেপাল থেকে এসে এই অঞ্চলে প্রথম বসবাস শুরু করেন। তখন প্রচণ্ডভাবে বৃটিশ আমল। নেপালের সঙ্গে ইংরেজদের ভারত সাম্রাজ্যের মিত্রতার বন্ধন। উমাশঙ্করের বাবার নেপালে অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল, রাণাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে তিনি সেখানকার অভিজাত সমাজেও বিশেষ গণ্যমান্য ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা ছিলেন বলেই রাণাদের রাজাশাসন পদ্ধতি বা রাজার ক্ষমতাহীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি কখনো কখনো বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করতেন না, ধীরে ধীরে ক্ষমতাহীনদের বিরূপ নজরে পড়ে যান। এমনি একসময়ে তিনি স্বেচ্ছায় নেপাল ছেড়ে চলে আসেন, এখানে বসবাস শুরু করেন। উমাশঙ্কর-

বাবুর পৈত্রিক সম্পত্তি এখনো নেপালের গাঁয়ে গঞ্জে-শহরে-বস্তিতে ছড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বছরে অনেক উপার্জন তাঁর ; এখানেও জমিজমা অনেক, সচ্ছল অবস্থা, এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর বাড়ি মূল শহরের বাইরে। পাথরের দোতলা বাড়ি, সামনে সবুজ লন, পেছনে নাশপতি-আপেল-কমলালেবুর বাগান; সামনে মকাই আর ধানের ক্ষেত ধাপে ধাপে নিচের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত নেমে গেছে।

আর মুখোমুখি তিস্তা।

দাশগুপ্তর সেই বাড়িটার কথা মনে আসছে, উমাশঙ্করবাবুর মুখটা ভেসে উঠছে। সমস্যাহীন তৃপ্ত মুখ, সাহিত্যচর্চা যে একধরনের প্রশান্ত মগ্নতা দেয় অনেকটা সেই রকমের। মুখটা মনে করতেই দাশগুপ্ত ভিতরে ভিতরে অস্থির বোধ করলেন।

কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শোভনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার একবার যাওয়া উচিত।'

শোভনা মাথা নাড়লেন। তবু একবার বললেন, 'আজ অনেক পরিশ্রম করেছ, কাল গেলে হয় না ?'

'না। আজই যাই। আমার ভালো লাগছে না।'

শোভনা বললেন, 'তাহলে হরকা-কে খবর পাঠাই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওদিকের রাস্তাঘাট খারাপ, তাছাড়া ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

দাশগুপ্ত আপত্তি করলেন না।

একটু পরেই হরকা এলো। হরকার সঙ্গে শোভনা টর্চ দিয়ে দিলেন। হাতে একটা লাঠি নিয়ে দাশগুপ্ত হরকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন ?

পথ চলতে চলতে তিনি কোন কথা বলছিলেন না। রাস্তাটা পুরো-পুরি পাকা নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে পাথর দিয়ে বাঁধা, মজবুত ; কিন্তু এ কদিনের বৃষ্টিতে অনেক জায়গা ভেঙ্গে গেছে। তব চলতে কোন

অসুবিধে হচ্ছিল না, ধসে যাওয়া জায়গাগুলোর পাশ দিয়ে মোটামুটি চলা যাচ্ছিল।

পথের দুধারে মাঝে মাঝেই নানা ধরনের ধ্বংসের চিহ্ন। কিছুদূর এগিয়ে এসে দেখতে পেলেন ডানদিকে ছোট্ট একটা বাড়ি, খড়ের চাল, মাটির দেয়াল, দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই একটা বড় বাড়ি, পাথর সিমেন্টে তৈরী, ধসে নিচের দিকে তলিয়ে গেছে। হরকাই দাশগুপ্তকে এই দৃশ্য দেখালো। তারপর সে ঘটনার কথা বললো।

মাটির বাড়ির লোকজন দুর্যোগে ভয় পেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঐ পাকা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল গতকাল রাতে; শক্ত মজবুত বাড়ি, ভয়ের কোন আশংকা নেই ভেবে নিশ্চিন্তে, সকলের সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবহারে কোথায় যেন একটা ঠাট্টা আছে; ঘুমের মধ্যে কখন যে সবাই চাপা পড়ে তলিয়ে গেল কেউ টের পেল না। আর দুর্বল খড়ের ঘরটি এখন বিকেলের রোদে পরিহাসের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশে।

রিলিফের লোকেরা এখানে এসেছিল, হরকা বললো। তারা আসবার আগেই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করেছিল স্থানীয় লোকেরা। এখন বিকেলবেলা সমস্ত জায়গাটা পরিত্যক্ত, হয়তো একটু বেশি নির্জন, কিন্তু দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, এই নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। সমস্তটাই যেন একটা বিবরণ, প্রাণহীন কাগজের খবর মাত্র। তাহলে দুঃখের বোধও একটা নির্বোধ বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে যায়?

হতে পারে। কিন্তু দাশগুপ্ত আর সেখানে দাঁড়ালেন না। এখান থেকে উমাশংকরের বাড়িটা দেখা যায় একটু নিচুতে। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটা মকাই ক্ষেতের পাশ দিয়ে কাঁচা পায়ে হাঁটা পথ বেয়ে তিনি দ্রুত সেদিকে নেমে গেলেন।

এই বাড়িতে ঢুকতে আজ এক অস্বস্তি বোধ করছিলেন দাশগুপ্ত। ফুলে ভরা বাগানে বিকেলের রোদ। ঢোকার পথ আগের মতই

পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার কোথাও কোনো ঝরা পাতাও পড়ে নেই। পথের দু'পাশে ছোট ছোট গাছে অসংখ্য ক্রিসান্থিমাম, গাছে গাছে নানা জাতের ফুলবাড়, বাড়িটাকে ঘিরে ঘন সবুজ আর্দ্রতা।

বাইরে বা ঘরের পর্চে কোনো লোক দেখা গেল না। বাগানের প্রান্তে তিস্তা উপত্যকার দিকে মুখ করে যে-কখানা সবুজ রঙের কাঠের বেঞ্চি ছিল, সেগুলো খালি পড়ে আছে। ওখানে বসে তিস্তার ওপারে পেশক চা বাগান, তার অফিস, গুদাম, হাসপাতাল, চা-বাগানের মধ্য দিয়ে দার্জিলিঙ যাবার সরু সর্পিল রাস্তা দেখা যায়। কতদিন দেখেছেন উমাশঙ্করবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে। দূরে মংপু পাহাড়, তিস্তা-ভ্যালি চা-বাগান। একই দৃশ্য তাঁর নিজের কোয়ার্টারের গাড়ি বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়েও দেখা যায়; কিন্তু স্থান পরিবর্তনে দৃশ্য ও দৃষ্টি দুই ই যেন অন্যরকম হয়ে যায়।

মন্থর পায়ে দাশগুপ্ত বারান্দায় উঠে এলেন। কাঞ্চি এসে দরজা খুলে দিল। বসবার ঘরে কেউ নেই, জানালার পর্দাগুলো কেউ খুলে দেয়নি বলে ঘরটা অন্ধকার। কাঞ্চি দাশগুপ্তকে ভেতরের দিকে একটা ঘরে নিয়ে এলো।

এই ঘরে দক্ষিণের জানালাটা খোলা; তার ধার ঘেঁসে একটা টেবিল। টেবিলে ঝুঁকে বসে আছেন উমাশঙ্কর, জানালার দিকে মুখ করে, ঘরে ঢোকার দরজা তাঁর পিছনের দিকে। টেবিলে লেখার কাগজ পত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ানো, দেয়াল জুড়ে বুক কেসে বই।

বোঝা গেল, এই উমাশংকরের স্টাডি। তিনি বসে বসে কিছু অস্থির ভাবে লিখছিলেন। দাশগুপ্ত মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বললেন, 'আসতে পারি উমাশঙ্করজী। আমি দাশগুপ্ত।'

উমাশংকরের লেখা থেমে গেল। দরজার দিকে মুখ ফিরে তাকালেন। তাঁর পেছনে জানালা, আলোর দিক থেকে এদিকে মুখ ফেরাতেই মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেল।

দাশগুপ্ত আবার বললেন, 'আমি দাশগুপ্ত।'

'আসুন দাশগুপ্তজী,' উমাশংকর চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে উঠে এলেন। দাশগুপ্তর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসালেন। নিজেও বসলেন পাশে।

'আপনি খবর পেলে একবার আসবেন, আমি জানতুম।' উমাশংকর বললেন, 'আত্মীয় স্বজনের বাইরে আপনিই প্রথম এলেন। একটু চা খান।'

দাশগুপ্ত কিছু বলবার আগে কাঞ্চি দরজা থেকে সরে গেল।

উমাশংকরবাবুর একটি মাত্র মেয়ে, নাম রত্না; একটি ছেলে, নাম অরবিন্দ। অনেক দেখেশুনে অনেক ঘটা করে জামাই এনেছিলেন ঘরে। জামাই সুকুমার, ডাক্তার। বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে কাঠমণ্ডুতে সরকারী হাসপাতালে যোগ দেয়। যশ হয়, মান হয়, প্রতিপত্তি হয়। বয়সের তুলনায় তার প্রতিষ্ঠা চোখে পড়ার মত।

দশাইতে রত্নাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সুকুমার। আনন্দে কেটে গেল পূজোর দিনগুলি, দশমী থেকে শুরু হলো অঝোর বৃষ্টি। ঘরে দু'দিন বদ্ধ হয়ে থাকতে থাকতে সে বোধহয় এক সময় হাঁপিয়ে উঠলো, ভেতর থেকে জেগে উঠলো তার পুরনো নেশা, মাছ ধরার নেশা। যখনই সে শ্বশুরবাড়ি আসে, একবার সে ছুটে যাবেই তিস্তায় মাছ ধরতে। কিন্তু এখন দুর্যোগ, এ-সময় তিস্তায় মাছ ধরতে যাওয়া প্রায় একটা পাগলামো, তবু সুকুমার তার ঝোলা গুছিয়ে নিল। নিষেধ এল সবার কাছ থেকে, কিন্তু কাঠমণ্ডুর সফল ডাক্তার সকালের চা জল খাবার খেয়ে কাঁধে তুলে নিল তার ঝোলা, হাতে নিল বঁড়শি। কতগুলি সস্নেহ না-র কাদামাটি ভেঙে খাড়া পথে তিস্তার দিকে নেমে গেল।

সুকুমার যেখানে মাছ ধরতে যায়, তিস্তা সেখানে দুভাগে ভাগ হয়ে একটা চর তৈরী করে একটু দূরে গিয়ে আবার মিশেছে, সেখান থেকে আবার এগিয়ে গেছে সমতলভূমির দিকে। ওখানটায় তিস্তা

দুভাগ হয়ে যাওয়ায় স্রোতের বেগ একটু কম থাকে, গ্রামের লোকজন ওপারের বস্তি বাজারে যাবার সময় সেইজন্যে এ-জায়গা দিয়েই নদী পার হয়। ঘাটে একটা ডিঙি থাকে, একটি ছেলে ঐ ডিঙিতে লোক-জনদের পারাপার করে, বিনিময়ে কিছু পয়সা পায়। সন্ধ্যা হলে একটা গাছের গুঁড়িতে ডিঙি বেঁধে রেখে সে বাড়ি ফিরে যায়।

'ওই ডিঙিতেই সুকুমার নদীর চরে গিয়েছিল,' উমাশংকর ধীরে ধীরে বললেন, 'সঙ্গে নিয়েছিল লক্ষ্মণ কামী-র ছেলে কালিকাপ্রসাদকে। বারো তেরো বছরের এই ছেলেটি সব সময়ই সুকুমারের মাছধরার সঙ্গী।'

কাঞ্চি চা নিয়ে এল এই সময়। সঙ্গে উমাশংকরের ছেলে অরবিন্দ।

উমাশংকর বললেন, 'কাল সারাদিন আমাদের কিরকম উদ্বেগে কেটেছে, সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন দাশগুপ্ত সাহেব। সন্ধ্যার কিছু পর গ্রামের লোক এসে দুঃসংবাদ দিল। আমরা কি তা বিশ্বাস করতে পারি, বলুন?'

কথা বলতে বলতে উমাশংকর উঠে পড়লেন। বোধহয় তিনি তখন একটু একটু কাঁপছিলেন। দাশগুপ্তর দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আপনি চা খান, আমি একটু আসছি।' তারপর একটু অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত অন্য ঘরে চলে গেলেন।

দাশগুপ্ত খুব বিব্রত বোধ করলেন।

অরবিন্দ বললো, 'আপনি চা-টা খেয়ে নিন কাকাবাবু। আমি বসছি।'

কাঞ্চি চায়ের ট্রে টা দাশগুপ্তর সামনে নামিয়ে রাখলো।

অরবিন্দ বললো, 'বাবার মানসিক অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না, না, একি মনে করবার সময়?' দাশগুপ্ত অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এ কেমন করে

হলো? সুকুমার মাছ ধরতে গিয়েছিল, ফিরে আসে নি। হতে তো পারে, সে কোথাও আটকে আছে, আসতে পারছে না!'

অরবিন্দ মাথা নাড়লো, 'না, কাকাবাবু, ওদের নিয়ে আমার করবার কিছু নেই। কাল রাতে যখন খবরটা এলো, তখন আমি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম যাচাই করে দেখতে। গ্রামের সবার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। যারা নিজের চোখে আগাগোড়া প্রায় দেখেছে জামাইবাবুকে ডুবে যেতে তাদের সবার সঙ্গে।'

অরবিন্দ হঠাৎ থেমে গেল বলতে বলতে।

দাশগুপ্তও তখনই কোনো কথা বললেন না।

একটু পর অরবিন্দ বললো, 'ডেডবডির কোনো খবর এখনো পাওয়া যায়নি। পুলিশকে জানানো হয়েছে, হয়তো খবর পাওয়া যাবে, হয়তো যাবে না। তবে আমরা নিশ্চিত, জামাইবাবু আর বেঁচে নেই। সঙ্গে কালিকাপ্রসাদও গেল। সমস্তটাই দুঃস্বপ্নের মতো, একটা নেশার গল্প বলতে পারেন।'

দাশগুপ্ত চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অরবিন্দর কথাগুলো শুনছিলেন।

দুদিনের টানা বৃষ্টিতে তিস্তার জল কিছুটা বাড়লেও তখনও খেয়া পারাপার বন্ধ হয়নি। নদী পার হয়ে সুকুমার নদীর চরে গিয়ে নামলো, তারপর বার করলো তার বঁড়শি। কালিকাপ্রসাদ এক খণ্ড পাথর তার বসবার জন্যে ঠেলে নিয়ে এল, তিস্তার স্রোতে বঁড়শি ফেলে বসে রইল সুকুমার। ছোটো ছোটো ঢেউ আর এলোমেলো বৃষ্টির ঝাপটায় ফাৎনাটা বার বার ডুবে যাচ্ছিল, আবার ভেসে উঠছিল। মাছে ধরেছে মনে করে সে দু-একবার বঁড়শিতে টানও দিয়েছিল, কিন্তু কিছু না, সবটাই ফাঁকি।

একটা নেশা যেন এমনি করে তার ওপর চেপে বসলো; সুকুমারের অন্য কোনো দিকে খেয়াল ছিল না, কালিকাপ্রসাদেরও না। যে ছেলেটি খেয়ানৌকো চালায়, সে নদীর এপারে তার ডিঙিতে

একলা বসে থাকতে থাকতে সুকুমার আর কালিকাপ্রসাদকে লক্ষ্য করছিল। সে তখনো বসেছিল কোনো যাত্রীর আশায়, কিন্তু এ দুর্যোগে কোনো যাত্রী ছিল না।

কখন নদীর জল ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে, সেদিকে কারো খেয়াল ছিল না। একসময় সুকুমার দেখল তার পা পর্যন্ত জলে ডুবে যাচ্ছে। অর্থাৎ নদী গ্রাস করতে শুরু করেছে চরভূমি। এক্ষুনি এখান থেকে চলে না গেলে বিপদ, এই রকম একটা কিছু বুঝেই সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে পারের সেই ছেলেটিকে ডাকলো, তার নৌকো চাই এক্ষুনি পালাতে হবে।

ছেলেটি বোধহয় স্রোতের গর্জনে আর হাওয়ায় সুকুমারের কোনো কথা শুনতে পায়নি, ঐ বৃষ্টির আবছায়ায় সে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল দু'হাত ওপরের দিকে তুলে সুকুমার আর কালিকা-প্রসাদ তাকে কিছু ইশারা করছে। মাঝি বুঝতে পারছিল ওরা তাকে ডাকছে, সে তৎক্ষণাৎ নৌকা থেকে নেমে দড়ি খুলে নিল ওদের আনতে যাবে বলে। সে দেখতে পায়নি উজানের দিক থেকে নদীতে প্রবলবেগে ঢল নেমে আসছিল। দড়ি খুলেই স্রোতের অস্বাভাবিক বেগ সে অনুভব করলো, দড়ি ধরে নৌকাকে সে সামাল দিতে পারছিল না। সে অনেক টানাটানি করে চেষ্টা করলো যদি নৌকাটাকে ডাঙার ওপর ওঠানো যায়। কিন্তু স্রোতের টান নৌকোর সঙ্গে তাকেও যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক এই সময় সেইখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ঢল, তার হাত থেকে ছিটকে গেল কোনোরকমে ধরে রাখা নৌকোর দড়ি, সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে গেল। সে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে খানিকটা উঠে এল, দেখল তার নৌকোটা স্রোতের টানে খানিকটা ভাটিতে গিয়ে ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। চার-পাঁচবার পাক খেয়ে নৌকোটা চোখের সামনে ডুবে গেল।

তার এখন আর কিছু করবার নেই। মুখোমুখি নদীর চরে সুকুমার আর কালিকপ্রাসাদ হাত-পা ছুঁড়ে অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে, তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে চাইছে কিছু, মাঝে মাঝে স্রোতের গর্জন আর হাওয়ার ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভেসে আসছে তাদের কিছু অর্থহীন চিৎকারের ধ্বনি। কিন্তু তার এখন আর কিছু করবার নেই। জল যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ডুবে যাবে ঐ চরটা, তখন? পার থেকে চরের দূরত্ব পঞ্চাশ যাট গজের বেশি নয়, মাঝি দেখালো: সুকুমার ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তার বঁড়শি, জলের চাপে ছোটো হয়ে আসা চরে প্রায় পাগলের মত ছুটোছুটি করছে, কালিকপ্রসাদ চরের মধ্যিখানে একটা পাথরের ওপর দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে।

কালিকাপ্রসাদ কি কাঁদছে? মাঝি জানে না। কিন্তু তার এখন আর কিছু করবার নেই। নৌকো সামলাতে গিয়ে তার খুব পরিশ্রম হয়েছিল, জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নৌকোটও ডুবে গেল, সেই নিয়েছিল একটা বিস্বাদ অনুভূতি, আর চোখের সামনে এই অসহায় দুটো মানুষ—সুকুমার আর কালিকাপ্রসাদ। একসময় সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, মনে হলো পাঁচমন ওজন তার শরীরের, কষ্ট হলো, তবু একটা গাছের ডাল ধরে উঠে দাঁড়ালো। প্রায় টলতে টলতে এলোমেলো ভাবে তারপর বস্তির দিকে চলে গেল লোকজনদের খবর দিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন এসে উপস্থিত হলো। এতক্ষণ পর্যন্ত একমাত্র মাঝি যার সাক্ষী ছিল, এখন তার সাক্ষী হলো অনেক। কিন্তু তারাই বা কি করবে? তিস্তার ঐ তীব্র স্রোতে উজান থেকে নেমে আসা সব গাছপালা কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে। নৌকো নেই, নৌকো থাকলেও এখানে যাওয়া সম্ভব নয়, স্রোতের টানে ভেসে যাবে। কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরী করে পাঠানোর চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু সে ভেলাও চরে গিয়ে পৌঁছবে না। অর্থাৎ তাদেরও কিছু

করবার নেই। একটা নির্মম সম্ভাবনার জন্য এখন অপেক্ষা করে থাকা শুধু।

সম্ভাবনা না অবশ্যম্ভাবী? দেখতে দেখতে জলে ডুবে গেল চরণ চরের মাঝখানে স্রোতের টানে অতীতে ভেসে আসা বড় বড় পাথরখণ্ড এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে; সবাই শঙ্কিত হয়ে দেখলো সুকুমার আর কালিকাপ্রসাদ হাত ধরাধরি করে ঐ রকম একটা উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালো। যদি জল আর না বাড়ে বা ক্রমে ক্রমে কমে যায়,—হা, ঈশ্বর, যদি!

ইতিমধ্যে মিলিয়ে গেল দিনের আলো, বৃষ্টি আর মেঘে সময়ের আগেই নেমে এল সন্ধ্যা, স্তিমিত অন্ধকার দ্রুত ঘন হয়ে উঠলো। হারিয়ে গেল সব দৃশ্যপট, মুছে গেল সুকুমার আর কালিকাপ্রসাদ কালো রাত তিস্তার কালো জলে একটা অর্থ ঢেলে দিল, গর্জনের ধ্বনিতে তার একটা আভাস পাওয়া যায়।

কিছুই দেখা যাচ্ছিল না; এতক্ষণ যা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল এখন তাও আড়াল। কিন্তু তবু কেউ ফিরে গেল না, বসে রইল। দুটো ছেলে বস্তি থেকে ছুটে গিয়ে নিয়ে এল দুটো লণ্ঠন, আর কয়েকজন মিলে ভেজা খড়কুটো একত্র করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলো তাতে যতটা আগুন হলো তার চেয়ে ধোঁয়া হলো বেশী। তবু চরের মধ্যে দুই মৃত্যুপথযাত্রী অন্তত বুঝতে পারবে এপারের অসহায় মানুষগুলো এই বিপদে তাদের পরিত্যাগ করে চলে যায়নি।

ঐ অন্ধকারে, বৃষ্টি ভেজা কুয়াশার আড়াল ছিঁড়ে এই সময় চরের মধ্য থেকে একটা আলো ঝলকে উঠলো। বুঝতে কষ্ট হলো না ওপারের আগুন দেখে সুকুমার তার টর্চের আলো জ্বেলে জানিয়ে দিচ্ছে তারা আছে। এপারে পাহাড়ের গায়ে লণ্ঠন আর আগুন, বিচ্ছিন্ন চরের বুকে টর্চের আলো; এপারের জীবন আর চরের জীবন মুখোমুখি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না।

চারদিক স্তব্ধ, তিস্তার গর্জন ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটু কান পেতে থাকলে এতগুলো লোকের হৃৎপিণ্ড থেকে উৎকণ্ঠার শব্দ হয়ত শোনা যায়। মেঘ পাতলা হয়ে আসছে, শুক্লা ত্রয়োদশীর আকাশে একটু আলোর আভা টের পাওয়া যায়, ওপারের পাহাড়ের অবয়ব এখন রেখার সীমায় ধরা যাচ্ছে, কিন্তু নদীর বুকে সেই অস্পষ্ট আলোর আভা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

এই সময় একটা চিৎকার উঠলো, এপারের গ্রামবাসীরা প্রায় আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ালো। চরের টর্চের আলোটা হঠাৎ জলের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

দূর থেকে একটা তীব্র ডাক ছুটে এল :

—কালিকাপ্রসাদ—

গ্রামবাসীরা পিছনের অন্ধকারের দিকে তাকালো।

লক্ষ্মণ কামী। কালিকাপ্রসাদের বাবা। অন্ধকার ছিঁড়ে এদিকে ছুটে আসছে। বাড়ি ফিরে খবর পেয়ে বোধহয় আর থাকতে পারেনি।

গ্রামবাসীরা তাকে জড়িয়ে ধরলো।

একটা নেশার গল্পই বটে। কিন্তু কার নেশা? সুকুমারের না তিস্তার ?

দাশগুপ্ত স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন।

অরবিন্দ বললো, 'আমাদের কাছে খবরটা একটু দেরিতেই আসে। বাড়িটা দূরে। তাছাড়া ঐ উদ্বেগের মধ্যে এখানে খবর দেবার কথা হয়তো কারো মনেই হয়নি।'

'ওরা সুকুমারকে চিনতো ?'

'কেউ কেউ নিশ্চয়ই চিনত' অরবিন্দ বললো, 'কিন্তু খবর দিয়েই বা কি হতো ? কিছু করবার ছিল না।'

'অর্থাৎ নিয়তি।' দাশগুপ্ত বললেন, 'তুমি নিয়তি মান ?'

'বাবা মানেন।'

'তুমি মান না?'

'আমার মনে হয়, এমনটা যে হলো তার কারণ সবটাই জামাইবাবুর জেদ। খুব জেদী লোক ছিলেন। বাড়ির সবাই বারণ করেছিলেন, শুনলেন না।'

কাঞ্চি এরই মধ্যে কখন ঘরে আলো দিয়ে গিয়েছিল, দাশগুপ্ত খেয়াল করেননি। এখন রাত হয়েছে। এতটা পথ ভেঙে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হবে, এখন বোধহয় তাঁর ওঠা উচিত। উমাশংকর এখনো এ ঘরে আসেননি। যাবার আগে তাঁকে একবার বলে যাওয়া ভদ্রতা।

'আপনি আরেকটা চা খান কাকাবাবু' অরবিন্দ বললো, 'এই ঠাণ্ডায় অনেকটা পথ যেতে হবে।'

'চা? তা খেতে পারি, উমাশংকরজী বোধহয় ক্লান্ত, ওকে আর বিরক্ত করে দরকার নেই।'

অরবিন্দ উঠতে গিয়ে বললো, 'ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি এসে যে কী ভালো হয়েছে কাকাবাবু। সারাদিন ঐ টেবিলে পাতার পর পাতা কি লিখে যাচ্ছেন। আপনি আসতে এই ক্ষ্যাপামিতে অন্তত বাধা পড়েছে।'

'ক্ষ্যাপামি?'

'তা ছাড়া আর কি। আপনি এলোমেলো ঐ কাগজগুলো একটু পড়ুন। আমি পড়েছি দুপুরে লুকিয়ে। বাধা দিতে চেষ্টা করেছি, শোনেননি।' অরবিন্দ একটু বিরক্ত হয়েই বললো, 'ওঁকে আজ আর এঘরে আসতে দেব না। আপনি বসুন কাকাবাবু, আমি চায়ের কথা বলি।'

অরবিন্দ চলে গেল। দাশগুপ্ত অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। অরবিন্দর কথায় একটা চাপা বিরক্তি ছিল, দাশগুপ্তর কাছে তা আড়াল থাকেনি। উমাশংকরের ছেলের কথায় এরকমটা

বোধহয় তিনি আশা করেননি।

অরবিন্দ চলে যেতে দাশগুপ্ত উমাশংকরের টেবিলের দিকে উঠে এলেন। টেবিলের ওপর এলোমেলো কাগজ ছড়ানো। এমন অভিভূত শোকের দিনে কী লিখছিলেন উমাশংকর? ক্ষ্যাপামি?—যা অরবিন্দ বলে গেল?

একটা কাগজ তুলে নিলেন দাশগুপ্ত। ফাঁকা ঘরে অন্যের লেখা এইভাবে গোপনে দেখার জন্যে তাঁর একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু কৌতূহলও হচ্ছিল খুব, বিশেষ করে অরবিন্দর কথার পর।

নেপালীতে লেখা কাগজ। ঝকঝকে হাতের লেখা উমাশংকরের, কিন্তু এখানে একটু জড়ানো। ইলেকট্রিক নেই, ঘরের সামান্য কেরোসিনের আলোয় দাশগুপ্ত লেখাটা পড়তে চেষ্টা করলেন। এলোমেলো লেখা। কোনো আরম্ভ নেই, কোনো শেষ নেই। হতে পারে অন্য কাগজে আছে। কিন্তু দাশগুপ্ত পড়লেন প্রথমেই কালিকাপ্রসাদের নাম।

কালিকাপ্রসাদের কান্না কি কেউ শুনতে পাচ্ছিল? অন্তত সুকুমার শুনেছিল। আর সুকুমারের কান্না? কালিকাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বোধহয় সুকুমার আর কাঁদতে পারেনি।

ওরা চারধারে সুন্দর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এই সময় পৃথিবীকে দেখবার চোখ কি থাকে? হয়তো ভাবনা থাকে। অনুতাপ থাকে। সুকুমারের অনুতাপ কি? ভাবনা কি?

মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু সে মৃত্যু যদি হঠাৎ এমনি করে আসে? কোনো আভাস নেই, সংকেত নেই, সে যদি নিঃশব্দে ঝোপের আড়ালে বিষ নিঃশ্বাস নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বসে থাকে আর তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে? মানুষ তখন কি করবে? সুকুমার তখন কি করবে? গুরুজনদের নিষেধ শোনেনি বলে অনুশোচনা করবে? না একটা ভয়কে দেখবে? পিঙ্গল চোখ, লিকলিকে

অস্বাভাবিক লম্বালম্বা আদিম পিচ্ছিল আঙুল, হলদে আঁশটে দাঁত, ঝুলে পড়া লোভী জিভে যার লালা ঝরছে? সেই ভয়ানকের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে সে কি তখন চিৎকার করে উঠবে?

এ পারের লোকজন সেই চিৎকার অন্তত একবারের জন্যে শুনে-ছিল বোধহয়।

উমাশংকর লিখছেন:

আমি হলে একটা ইস্পাতের ছুরি চরের দিকে ছুঁড়ে দিতাম। কিন্তু তাতেই বা কি হতো? কিছু করবার নেই বলে এতগুলো লোক পাহাড়ের গায়ে নিঃশব্দে বসে রইল! কিছু তো একটা করতে হবে!

এই কাগজের লেখা এখানে শেষ। অন্য কাগজে অন্য লেখা থাকতে পারে। কিন্তু দাশগুপ্ত অন্য কাগজ তুললেন না, এই কাগজটা রেখে দিলেন শুধু।

সামনে খোলা জানালা। একটু একটু হিম আসছে। বাইরে জ্যোৎস্না, বাগানের ফুল, গাছ, লতা এই জ্যোৎস্নায় স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে। চারধারে কোনো শব্দ নেই, স্বল্পালোকিত ঘরে একা দাশগুপ্ত, টেবিলের ওপর উমাশংকরের লিখিত অস্থিরতা, অরবিন্দ এখনো ফিরে আসেনি।

দাশগুপ্তর মনে হলো, উমাশংকর সমস্ত ঘটনার একটা পোস্ট-মর্টেম করতে চাইছিলেন। হতে পারে, না-ও হতে পারে। উমা-শংকর সাহিত্যিক, কোনো ঘটনা কি প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ওপর আছড়ে পড়বে দাশগুপ্তর মত সাধারণ লোকের তা জানবার কথা নয়। তবু যে পরিবারে সদ্য এমন একটা হাড়কাঁপানো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেখানে শোক বলীয়ান হয়ে বাড়ির লোকজনকে পর্যন্ত গোপন করে রেখেছে, সেখানে উমাশংকর সেই দুর্ঘটনার বিশ্লেষণ করছেন, তর্ক করছেন সুকুমারের পক্ষে, সহানুভূতি জানাচ্ছেন কালিকাপ্রসাদকে, অভিযোগ আনাছেন গ্রামবাসীদের আচরণ নিয়ে, অর্থাৎ মুখর হয়ে উঠছেন

নিজের মধ্যে। কিছুতেই ব্যাপারটা মেলাতে পারছেন না দাশগুপ্ত শোক কি তাহলে উমাশংকরের মধ্যে একধরনের মানসিক স্ফূর্তি এনে দিল?

উমাশংকরকে শ্রদ্ধা করেন দাশগুপ্ত; কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মনে হলো তাঁর আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিলাস আছে। শোকও যে বিলাসের সামগ্রী হয়ে ওঠে, উমাশংকরকে দেখে আজ তাঁর মনে হলো। আজ সারাদিন ধরে শোকের নিরাবরণ মূর্তি তিনি দেখে এসেছেন, এখানে যেন তিনি একটা হোঁচট খেলেন।

অরবিন্দ এল। সঙ্গে কাঞ্চির হাতে চা।

দাশগুপ্ত চা হাতে নিয়ে অরবিন্দকে বললেন, তুমি বলেছিলে তোমার বাবা নিয়তি মানেন। ওঁর লেখা থেকে তা মনে হলো না।

'কিন্তু জীবনে তিনি তা বিশ্বাস করেন,' শান্ত গলায় অরবিন্দ উত্তর দিল।

'জান অরবিন্দ,' চা খেতে খেতে দাশগুপ্ত বললেন, 'আমি নিয়তি বিশ্বাস করি। আজ সারাদিন ধরে এমন সব অবিশাস্য ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, যার অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব না। আমারও মনে হয়, উমাশংকরজী বিশ্বাস করেন।'

'কিন্তু তাতে কি হলো?' অরবিন্দ সামান্য হাসলো, 'আপনি বাবার বন্ধু তবু আপনাকে বোধহয় বলা যায়। আসলে সমস্ত ব্যাপারই ঘটনামাত্র, যেমন সম্পত্তিরক্ষা করা, সম্পত্তি হারানো, চাকরি পাওয়া, চাকরি হারানো, পাশ করা, ফেল করা, ঘুমোনো, জেগে ওঠা— এই রকম আর কি। জ্যাস্ট এ প্রোসেস্।'

দাশগুপ্ত চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অরবিন্দর দিকে একবার সোজাসুজি তাকাতে চেষ্টা করলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে বললে, 'হতে পারে।'

পরেরদিন সকালে কালিম্পঙের আকাশে কোনো মেঘ ছিল না।

রোদ ছিল তেজী, বুনো চেরী গাছের মাথা ছুঁয়ে রেলি নদীর দিক থেকে হাওয়া বইছিল। উত্তরের বরফ পাহাড় নির্বিকারভাবে স্বাভাবিক, বোধহয় একটু বেশি ধারালো। তার ধৈর্য্য যে ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে একটু লক্ষ্য করলে তা টের পাওয়া যায়।

দাশগুপ্ত সাত সকালেই অফিসের কিছু কাজ সেরে নিলেন। তার পর অপিস থেকে কোয়ার্টারে এসে শোভনাকে কফি দিতে বললেন। কফি খাচ্চেন, এমন সময় পুলকেশ এল।

'এসো, পুলকেশ,' দাশগুপ্ত সহাস্যে পুলকেশকে বসতে বললেন।

পুলকেশ বসতে বসতে বললো, 'আসতে বললেন, বসতে বললেন, কিন্তু কফিটা তো একা একা প্রায় শেষ করে বসে আছেন দাদা। এটা কি ঠিক হলো?'

'তুমি কফি খাবে?'

'অবশ্য। চা খাবে বললে বলতুম টা-ও খাব।'

দাশগুপ্ত হেসে ফেললেন। শোভনা পুলকেশের গলা পেয়ে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বললো, 'টা খেতে হলে দোকান-বাজার খোলা রাখতে হয়। খুলেছেন কিছু?'

'আলবৎ', পুলকেশ জোর দিয়ে বললো, 'ওসব পাবেন না বৌদি, শহর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে রেখেছি।'

'তাহলে জাঁদরেল সরকারী লোক বলতেই হয় আপনাদের।' শোভনা একটু ঠাট্টা করলো. 'বসুন, চা-ই নিয়ে আসছি আপনার জন্যে।'

শোভনা ভেতরে চলে গেলে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর এদিকে সাতসকালে কোথায় এসেছিলে?'

'সরকারী কাজে, দাদা, রাস্তাটা তো ঠিক করে ফেলতে হবে।'

'কেমন বুঝছ?'

'কাল সকালে আপনার বাড়িতে জিপ নিয়ে আসব চা খেতে।'

'এত তাড়াতাড়ি রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে?'

'আপনার বাড়ি অবধি হবে। চুপিনদাড়া পর্যন্ত হতে আজ দুদিন লাগতে পারে।'

'তোমরা তো চমৎকার কাজ করছ হে,' দাশগুপ্ত একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'সোমনাথ মাস্ট বি এ ভেরি প্রাউড ম্যান।'

'যা বলেছেন দাদা, এইরকম একজন এস. ডি. ও আছেন বলে অনেক কিছু হচ্ছে। আজ ভোরের কথাই ধরুন না,' পুলকেশ একটু ঝুঁকে এল দাশগুপ্তর দিকে, 'ঘুম থেকে উঠে একটু বারান্দায় এসেছি, তখনো সূর্য ওঠেনি, দেখি স্যর খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তো অবাক। কোনোরকমে চোখে মুখে জল দিয়ে পেছনে ছুটলুম। পেলুম এসে থানায়।'

'এত ভোরে ওখানে কি করছিল?'

'গিয়ে সব শুনলুম। ভোর হবার আগে বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে, গেছেন তিস্তা ভিউ হোটেলে। কিছু ট্যুরিস্ট লাভা হয়ে গরুবাথান দিয়ে হাঁটা পথে নাকি নেমে যাবে। তিনি তাদের বোঝাতে গেছেন এ ঝুঁকি তারা যেন না নেয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি তাঁদের পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু ওরা যাবেই।'

'খুবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার আছে পুলকেশ।'

'কিন্তু স্যর তো অ্যাডভেঞ্চার বলে বসে থাকতে পারেন না। ওঁর তো দায়িত্ব আছে।'

'কি করবার আছে সোমনাথের?'

'কথা না শুনলে কিছুই করবার নেই। তবু তিনি যুধিষ্ঠিরকে একটু সতর্ক করে দিলেন। তারপর থানায় এসে হরিশ প্রধানকে দিয়ে আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। লাভার পথে যে আর্মি ক্যাম্পগুলো আছে, ওয়্যারলেসে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে এইরকম একটা দল ঐ পথে যাচ্ছে। সম্ভবমত সাহায্য করতে।'

'ওরা কি শেষ পর্যন্ত রওনা হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, দাদা। আমরা তখন থানার সামনেই ছিলাম।'

'একটি মেয়েকে দেখলে সঙ্গে ?'

'দেখলুম। এ রকম দুঃসাহসী বাঙালি মেয়ে দেখা যায় না দাদা।'

দাশগুপ্ত একটু হাসলেন: 'এ রকম দেখলে আমার কিন্তু ভারি ভালো লাগে।'

'আমারও খুব খারাপ লাগে বলি না' পুলকেশ বসবার ভঙ্গিটা একটু বদলে নিল, 'ওরা যখন রওনা হয়ে গেল, তখন ওদের চলা আর পরিবেশ মিলে চমৎকার দেখাচ্ছিল।'

শোভনা পুলকেশের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এল। পুলকেশ খেতে খেতে বললো, 'তবে গোপাল পাল ওদের খুব করেছে। যার যা লাগেজ ছিল সব এস. ডি. ও-র সামনে ষ্টোরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়েছে। যার যখন সম্ভব হবে নেবার ব্যবস্থা করবে।'

আজ সারাদিন দাশগুপ্ত আর বেরোলেন না। পুলকেশের সঙ্গে কথায় কথায় ঘরে বসেই শহরের একটা মোটামুটি খবর পেয়ে গেলেন। দুপুরে বিশ্রাম নিলেন, বিকেলের দিকে রোজকার অভ্যাসমত শহরের মুখে পা বাড়ালেন।

গতকালের পরিশ্রম আর অভিজ্ঞতার পর আজকে সমস্তটাই অল্প-বিস্তর স্বাভাবিক লাগছে। স্বাভাবিক থাকা, স্বাভাবিক হওয়া ব্যাপারটা এত দুর্মূল্য, আগে জানা ছিল না। রোজ বিকেলে এই পথে শহরে নেমে যাওয়া, খবরের কাগজ নেওয়া, দু-চারজনের সঙ্গে পথে বা থানার মোড়ে দেখা হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু গল্প, কিছু অপরিচিত লোকের অনির্দিষ্ট ঘোরাফেরার দিকে তাকিয়ে নিজের কাছেই বলা: 'সারা বছরই আজকাল ট্যুরিস্টের সীজন্ হয়ে গেল দেখছি!' সব মিলে এত গতানুগতিক অথচ এত স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মন্থরতাও

যে কখনো কখনো এত মহার্ঘ হয়ে ওঠে, এই কদিন ধরে তাই যেন বোঝা যাচ্ছিল। আজ পড়ন্ত বিকেলের রোদে পথ চলতে গিয়ে দাশ-গুপ্তর মনে হচ্ছিল যেন তিনি সেই স্বাভাবিক দৃশ্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।

সোমনাথের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দাশগুপ্ত দেখলেন সোমনাথ তার বাগানে বসে চা খাচ্ছে। তিনি একবার ভাবলেন সোমনাথের সঙ্গে কথা বলে যাবেন, কিন্তু তখনি থানার মোড়ে শহরের স্বাভাবিক সন্ধ্যা বিকেলের ছবি তাঁর কাছে এমন জীবন্ত হয়ে উঠলো যে, তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। কিন্তু সোমনাথের চোখ এড়ানো গেল না।

অগত্যা আসতেই হলো। সোমনাথের বাগানে বসতে হলো তার মুখোমুখি হয়ে। সামনে সিকিমের পাহাড়, তিস্তা এত নিচে যে দেখা যায় না। পাহাড়ের মাথায় বরফের কারুকার্য মলিন হয়ে আসছে শেষ বিকেলের ছায়ায়।

সোমনাথ বললো, 'কাল দুপুর থেকে আপনাকে আর দেখিনি দাদা। আমাকে কি ত্যাগ করলেন?'

দাশগুপ্ত সংকুচিত হলেন, 'কি যে বলো!' একটু পর বললেন, 'আসল কথা কি জান, কাল সব দেখেশুনে আমি কেমন ক্লান্তি বোধ করছিলাম, আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। তাই আর বাড়ি থেকে বেরোই নি। আজ বিকেলে মনে হলো যাই শহরে, সেখানে গেলেই রোজ কার মত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখতে পাব। সবটাই স্বাভাবিক আছে, কিছুই হয়নি, সবটাই বানানো একটা দুঃস্বপ্ন।'

সোমনাথ দাশগুপ্তর দিকে সোজা তাকিয়েছিল। দাশগুপ্তর কথা শেষ হলে সে সামান্য একটু হাসলো; বললো, 'কিন্তু কিছুই বানানো নয় দাদা, সবটাই ঠিক-যা ঠিক তাই। শহরের মেন-রোডে গিয়ে দেখুন, কিছুই স্বাভাবিক নয়। এত তাড়াতাড়ি সব স্বাভাবিক হয়।'

দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন। তাঁরই বোকামি। বললেন, 'তবু

সোমনাথ, আমার কিন্তু মনে হয়েছিল। কেন মনে হয়েছিল জানি না।'

সোমনাথ তখনি কোন কথা বললো না। একটু পর বললো, 'তবে কি জানেন দাদা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করছি। মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে এই একটু আগেই তো ফিরলাম।'

দাশগুপ্ত সোমনাথের দিকে তাকালেন।

সোমনাথ বললো, 'সকালে জি. ও. সি. খবর পাঠালেন কলকাতা মিলিটারীর হেলিকপ্টার রিলিফের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। দুপুরে শিলিগুড়ির এস. ডি. ও-ও রেডিওগ্রাম পাঠিয়েছেন। কাল সকাল থেকে হেলিকপ্টার রিলিফের জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আসতে শুরু করবে। কোনো কোনো জিনিসের আগে প্রয়োজন হবে তা তাড়াতাড়ি জানাবার জন্যে রেডিওগ্রামে বলা হয়েছে। সারাদুপুর বসে স্কোয়াড মাস্টারদের ডিম্যাণ্ডগুলো খতিয়ে দেখে একটা প্রায়োরিটি লিস্ট তৈরি করে শিলিগুড়িকে জানিয়ে দিয়েছি। খাবারটাই জরুরি, তার সঙ্গে কিছু কম্বল ও জামাকাপড় আর কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধও দরকার। আশা করছি কাল থেকে কিছুটা স্বস্তি পাব।'

'কিন্তু তোমার হেলিকপ্টার এসে নামবে দুর্পিণদাড়ায় ; সেখান থেকে জিনিসপত্র শহরে আনবে কেমন করে? রাস্তার যা অবস্থা।'

'কেন, দে-সরকার রাস্তা তো প্রায় ঠিক করে এনেছে।'

'সে তো ধরো আমার বাড়ি পর্যন্ত হয়তো হয়ে যাচ্ছে আজকের মধ্যে।' দাশগুপ্তর কথায় সন্দেহ যায় না, 'পুলকেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও বললো দুর্পিণদাড়া পর্যন্ত রাস্তা ঠিক হতে আরও কিছু সময় লাগবে।'

সোমনাথ জানালো, 'সকাল অবধি পজিশনটা অবশ্য এরকমই ছিল। তারপর কাজটা আরও এগিয়েছে। আর্মির লোকেরা ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে মেরামতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। দে সরকার শহরের

দিক থেকে রাস্তা ঠিক করতে করতে ক্যান্টনমেণ্টের দিকে এগিয়ে যাবে, আর আর্মি ক্যান্টনমেণ্টের দিক থেকে শহরের দিকে এগিয়ে আসবে। দে উইল মিট টুগেদার বাই টু-মরো নুন্। কাজেই রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে।'

পাহাড়ে এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। কালো হতে হতে বরফের চূড়ো এখন দৃষ্টির আড়ালে। ইলেকটিক নেই, কাজেই শহরের রূপরেখা এখন আর ধরা যাচ্ছে না।

সোমনাথ বললো, 'কাজের দায়িত্বও মোটামুটি ভাগ করে দিয়েছি। ফুডের তপনবাবু রিলিফ মেটেরিয়্যাল সব রিসিভ করবেন, তারপর তিনিই সে-সব ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেবেন প্রয়োজন অনুযায়ী। এডুকেশনের সজল রায়কে তো চেনেন? ওকে দিয়েছি ট্যুরিস্টদের ভার। হেলিকপ্টার রিলিফ মেটেরিয়্যাল নামিয়ে ফিরে যাবার সময় আটকে থাকা ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাবে। ওঁকে বলে দিয়েছি হোটেলে ঘুরে কত ট্যুরিস্ট আছে, আর কারা ফিরে যেতে চায়, তার একটা লিষ্ট তৈরি করে ফেলতে।'

'এটা তুমি একটা ভালো ব্যবস্থা করেছ।'

'আপনি কাল যাবেন একবার?' আবছা-অন্ধকারেও বোঝা গেল সোমনাথ দাশগুপ্তর দিকে তাকালো, 'ছূর্পিণদাড়া? আপনি সিনিয়র মানুষ, সবাই শ্রদ্ধা করে, আপনি থাকলে ওখানে যারা ডিউটিতে থাকবে, তাদের হয়তো একটু ভালো লাগবে।'

দাশগুপ্তর বাড়ি থেকে ছূর্পিণদাড়া খুব বেশি দূরে নয়। প্রায় সমতল পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খাড়া একটা পাহাড়ে ওঠা। ওই সময় বেশ পরিশ্রম হয়। তবু দাশগুপ্ত সোমনাথের কথায় না বলতে পারলেন না।

'বেশ তো, তুমি যখন বলছ, একবার যাব।'

'এ খুব ভালো হলো দাদা,' সোমনাথ খুশি হয়ে বললো, 'আমি সম্ভবত যেয়ে উঠতে পারব না, একবাব রিলিফ ক্যাম্পে যেতে হবে।'

'রিলিফ ক্যাম্প ?'

'হ্যাঁ, ছুটো রিলিফ ক্যাম্প করা হয়েছে। ক্যাম্প মাস্টার একবার যেতে বলে পাঠিয়েছেন, কিছু প্রবলেম্ হয়েছে বোধহয়।'

'কাল তো এরকম ক্যাম্পের কথা কিছু শুনিনি।'

'কালকে বিকেলেই তো তাড়াতাড়ি ছুটো ক্যাম্প খোলার ব্যবস্থা হলো। কিছু অসহায় গৃহহীন মানুষকে নিয়ে স্কোয়াড-মাস্টার-রা কিছুই করতে পারছিলেন না। তখনই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

এই সময় বাগানের গেটে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠলো।

'কে ওখানে ?' সোমনাথ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'আমি ইন্সপেক্টর প্রধান, স্যর। আসব ?'

'ও, প্রধান ? আসুন, আসুন। কোনো নূতন খবর আছে ?'

প্রধান চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'তা আছে, বলতে পারেন।'

হরিশ প্রধান যে বিবরণ দিলেন তা ট্যুরিস্টদের সম্পর্কে। আজ সকালে টুরিস্টদের যে দলটি হাঁটা-পথে রওনা হয়ে গেছে, মাইল কয়েক দূরে গিয়ে তাদের একজন এ্যাক্সিডেণ্টে পড়ে। আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে টুরিস্টদের একজন ফিরে এসেছে।

'অন্যান্যরা ?'

'তারা এগিয়ে গেছে।' প্রধান জানালেন, 'আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, পায়ে প্লাস্টার করে দিয়েছি। এখন সে তিস্তা ভিউ হোটেলে আছে।'

'হোটেলে কেন ?'

'হাসপাতালে, শুর জায়গা নেই। তাছাড়া আঘাত তেমন গুরুতর নয়, পায়ের গোড়ালির একটা হাড় সরে গিয়েছে মাত্র।'

'যাক, তবে অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে এই যা। কতবার বারণ করেছি, যাবেন না, তবু কথা শুনল না।' সোমনাথ একটু বিরক্ত হয়েই বলছিল ; 'মিঃ প্রধান কি আমাকে একবার তিস্তা ভিউতে যেতে বলেন ?'

'আমার মনে হয়, দরকার নেই।' প্রধান আড়ষ্ট গলায় বললেন। 'শুধু খবরটাই আপনাকে জানাতে এসেছিলাম।'

দাশগুপ্ত এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। খবরটা শুনে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনে হলো, হোটেলে গিয়ে একবার আহতকে দেখে আসা উচিত, অনন্ত সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

বললেন, 'তুমি সারাদিন পরিশ্রম করেছ, এখন ক্লান্ত। কাজেই তুমি বিশ্রাম কর সোমনাথ। আমি বরং একবার দেখে যাই ফেরার পথে।'

'কিন্তু আপনারও তো রাত হয়ে যাচ্ছে, দাদা। এতটা পথ আবার ফিরে যেতে হবে। একা একা।'

প্রধান বললেন, আমি বরং দাশগুপ্ত সাহেবের সঙ্গে একজন সিপাই দিয়ে দেব ; ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'তাহলে অবশ্য মন্দ হয় না।' সোমনাথ দাশগুপ্তকে বললো, আপনি একবার তবে ওকে দেখেই যান, দাদা। বলবেন, কালকেই ওকে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রধানকে বললেন, 'আর আপনি সজল রায়কে জানিয়ে দিন, কালকে ট্যুরিস্টদের ফেরার লিষ্টে এর নাম যেন প্রায়োরিটি পায়।'

আহতের নাম বিকাশ। দাশগুপ্ত, বিকাশের কাছ থেকে ঘটনার যে বিবরণ পেলেন, তা মোটামুটি এই রকম :

ওরা রওনা হয়েছিল খুব সকালে, তখনও শহরের বেশির ভাগ লোকই ঘুম থেকে ওঠেনি। একটু এগোতেই সূর্য উঠলো, তার আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠলো। বাঁদিকে বরফ পাহাড়। সূর্যের স্পর্শে কাঞ্চনজঙ্ঘা লাল হয়ে উঠেছে, পাশে কাঞ্চন ঝাউ শাদা বরফের বেষ্টনী তৈরি করে মালার মত জড়িয়ে আছে তাকে, সেখানেও রোদের ছোঁয়া লেগেছে। দূরে তিস্তা রঙ্গিতের সঙ্গম দেখা যায়। ডানদিকে রেঙ্গিত নদী, ধাপে ধাপে ধান ক্ষেত তার তীরভূমি পর্যন্ত নেমে গেছে। মাঝে

শুধু ধ্বংসের স্তূপ ; অনেক বাঁশঝাড় জল কাদার স্রোতে নিচের দিকে নেমে গিয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনেক গাছপালা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পাল্লানদীর ক্ষীণ-ধারায় রোদ পড়ে জল ও বালি দুই চকচক করছে। দূর দিগন্তে আকাশের বুকে মাথা তুলে উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কাফের বনভূমি। তার নিচের দিকের এক বিস্তীর্ণ অংশ ধসে পড়ে বিষাক্ত একটা ক্ষতের মত দগ্ দগ্ করছে।

ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল পি-ডব্লু-ডির পিচ-ঢালা রাস্তা দিয়ে। প্রথমে দলপতি লামাবাবু, সঙ্গে বিজনবাবু। অন্য সকলে তাদের পেছনে গল্প গুজব করতে করতে চলছিল। সবার পেছনে বিকাশ আর রেণু, পুরনো স্মৃতি নিয়ে একটু অন্যমনস্ক।

রাস্তার পাশেই এক জায়গায় কয়েকটা চেরী গাছ কাত হয়ে পড়েছিল। লামাবাবু তার ঝোলা থেকে কুক্‌রী বার করে করে কয়েকটা ডাল নিয়ে ডালগুলো মাপ মত কেটে নিল। তারপর প্রত্যেক সহযাত্রীকে একটা একটা করে বেঁটে দিল। অন্যান্য গাছের তুলনায় চেরী গাছের ডাল নাকি বেশি মজবুত, এই দুর্গম পথে তৃতীয় পা হিসেবে প্রত্যেকের কাছে একটা লাঠি থাকা বিশেষ দরকার। এক একটা লাঠি হাতে পেয়ে প্রত্যেকে তা একবার শূন্যে ঘুরিয়ে হাওয়ার সাথে একটু লড়াই করে নিল।

ধীরে ধীরে তোপখানার ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে শহরের শেষ সীমায় এসে পৌঁছল ওরা। এখন পর্যন্ত রাস্তা মোটামুটি ভালো, এখানে সেখানে যা ভেঙেছে তা এড়িয়ে এদিক-ওদিক দিয়ে চলতে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। রোদ ক্রমেই চড়ে উঠছিল, কিন্তু নিচের উপত্যকা থেকে ছুটে আসা পুবান হাওয়ায় তা বোঝা যাচ্ছিল না। রেণু একটু বেশি পেছনে পড়ছিল, দলের সঙ্গে বিকাশ এগিয়ে গেছে অনেকটা। কিন্তু রেণু আবার যখন দলের সঙ্গে এসে মিশলো, সবার চোখেই তখন প্রথম পড়লো যে তার পরনে সেই বাদামি রঙের নাইলন জর্জেট শাড়িটি আর নেই, সে এখন পরে আছে কালো রঙের স্ল্যাক্‌স্। সবাই সকৌতুকে

দেখলো, কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না। বিকাশ হয়তো কিছু বলতে পারতো, কিন্তু সে-ও চুপ করে রইলো।

লামাবাবুর কথা থেকে বোঝা গেল, সামনে রাস্তা চড়াই। আট মাইলের মধ্যে দু-হাজার ফুট উঠে আলগাড়া, তারপর আরও দু হাজার ফুট উঠে লাভা। লাভা থেকে সেই পথ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে গেছে, কুড়ি মাইল পথ এইভাবে নেমে গেলে তবে সমতলের গরুবাথান।

দীর্ঘ সংকুল পথ। লামাবাবু বললেন, ওঠবার সময় আস্তে চলাই ভালো। এতে চলার গতি হয়তো একটু কমবে, কিন্তু তাতে পরিশ্রম কম হবে ও তা নিরাপদ। ওরা এই ভাবেই চলছিল, এবং লামাবাবুর কথামত কথা প্রায় বন্ধ করে। কিন্তু সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ছিল একটা মজা, কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছিল ভয়, এবং বিকাশ এরই মধ্যে মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে গলায় সুর তুলতে চেষ্টা করে গেল।

সামনে দলপচাঁদ ফরেস্ট। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পিচের রাস্তা চলে গেছে। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ফরেস্টের একটা অংশ উপর থেকে নেমে এসে রাস্তাঘাট মুছে দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, নূতন অরণ্য সৃষ্টি করেছে অন্য এক জায়গায়। পাহাড়ের গা বেয়ে স্থানে স্থানে জলের স্রোত; খুব প্রবল কিছু নয়, কিন্তু মাটি নরম করে দিয়ে জায়গাটা বিপজ্জনক করে তুলেছে। লামাবাবুর নির্দেশে সমস্ত দলটা দাঁড়িয়ে পড়লো। রাস্তাটা ধসে পড়েছে, চিহ্নমাত্র নেই। লামাবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি জানি রাস্তাটা এখান থেকে বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছিল। যাইহোক, এর মধ্য দিয়েই আমাদের খুব সাবধানে ধীরে ধীরে চলতে হবে। একবার যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত এগনো যায়।'

লামাবাবুর কথায় সবাই খুব উৎসাহিত হলো; নতুবা পথের এই রকম ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে প্রত্যেকেই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। বিকাশ একটু পেছনে ছিল, হঠাৎ কয়েকজনকে ডিঙিয়ে সত্যেন ও

সমাজপতির মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সে ভয় পেয়েছে।

মাটির দিকে তাকিয়ে খুব সন্তর্পণে লামাবাবুর পিছু পিছু চলছিল সমস্ত দলটা। লাঠি দিয়ে সামনের মাটির অবস্থা পরীক্ষা করে লামাবাবু সবার আগে চলছিলেন, আর সবাই ঠিক তেমনি করে তাঁকে অনুসরণ করছিল। জল ভেজা পথে চলতে গিয়ে সবার জুতোমোজা ভিজে গিয়েছিল; লামাবাবু সবাইকে খালি পায়ে হাঁটবার পরামর্শ দিলেন। খালি পায়ে পাথুরে পথে ছোটখাটো আঘাত লাগাবার সম্ভাবনা একটু থাকেই, তবু পথ চলবার পক্ষে সেটাই সুবিধেজনক।

এইভাবেই চলছিল। মনে হচ্ছিলো কোনো দুর্গমের পথে চলেছে এক অভিযাত্রীদল। পাহাড়ের অবরোধ থেকে সমতলের মুক্তিতে যে তারা যাত্রা করেছে এই বোধটাই যেন মুছে গেছে। প্রখর নীল, আকাশ, তীক্ষ্ণ তীব্র রোদ, বনে ঘেরা পাহাড়, বরফচূড়া, আর বহমান হাওয়া -- সব মিলে এক অপার্থিব চিত্রপট রচিত হয়ে আছে। বিকাশ কি এই মুহূর্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? সেই তার্কিক রাগী বিকাশ? তার গলার গান ইতিমধ্যে থেমে গিয়েছিল, সে এড়িয়ে যাচ্ছিল রেণুর সঙ্গ, ভয় আর ভালোলাগার টানাপোড়েনে তৈরি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা তাকে এক অনিশ্চয়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

একটা নড়বড়ে পাথরে পা দিয়েই হঠাৎ নিচের দিকে পিছলে পড়ে গেল বিকাশ। লামাবাবু ও অন্যান্য যারা আগে আগে চলছিল, তারা কিছুই টের পেল না। কিন্তু সমাজপতি আর রেণু সেই সময় একটু পেছনে থাকায় ব্যাপারটা তারা দেখলো। সমাজপতি দেখলো, বিকাশ গড়িয়ে গড়িয়ে পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে পড়ে গিয়ে একটা হেলে পড়া গাছে ধাক্কা খেয়ে আটকে গেল। রেণু হো হো করে হেসে উঠলো। সবাই পেছনে ফিরে তার দিকে তাকালো।

অপ্রতিভ রেণুর হাসি থেমে গেল। সে সবাইকে হাত দিয়ে

বিকাশের অবস্থা দেখালো। লামাবাবু চীৎকার করে উঠলেন : কী সাংঘাতিক! সমাজপতি বললেন, 'অধৈর্য হয়ে লাভ নেই। ও বেঁচে আছে। 'জল', 'জল', বলছে, আমি অস্পষ্টভাবে শুনেছি। কিন্তু ওকে কিভাবে তুলে আনা যায়?'

লামাবাবু একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ধসে গড়িয়ে পড়া থমকানো কয়েকটা গাছের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেলেন। একজন একজন করে দলের আরো কয়েকজন ঐভাবে নেমে গেল। বিকাশের কাছে পৌঁছতে তাদের মিনিট পনের সময় লাগলো।

লামাবাবুকে দেখেই তাঁর দুহাত জড়িয়ে ধরলো বিকাশ : আমাকে বাঁচান। সে যেভাবে শুয়েছিল, এখন আর সেভাবে নেই, উঠে বসেছে, কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না ; হয়তো পায়ে চোট পেয়েছে অথবা ভয় পেয়েছে।

সকলে মিলে ধরাধরি করে ওকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হলো তবু, কিন্তু নিরাশ হতে হলো। ধরাধরি করে এবার একে ওপরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ; কিন্তু তুলে নেওয়াও প্রায় অসম্ভব। লামাবাবুর নির্দেশে যারা বিকাশের কাছ পর্যন্ত নেমে এসেছিল, তারা দুটো দলে নিজেদের ভাগ করে নিল। একদল কোনোও রকমে কয়েকফুট ওপরে তুলে আনে তো আরেকদল পরের ভার নেয়। প্রথম দল আবার এগিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় দলের কাছ থেকে ভার নিয়ে নেয়। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় বিকাশকে ওরা ওপরে তুলে নিয়ে এলো। ভিজে মাটির ওপরই শুইয়ে দেওয়া হলো, এছাড়া কোন উপায় ছিল না।

এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বিকাশ আর হাঁটতে পারবে না, কাজেই ওকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। ওকে শহরেই ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু সবার আগে দরকার ওকে কিছু ফার্স্ট এইড দেওয়া।

লামাবাবু বললেন, 'আপনারা দু-একজন একটু এগিয়ে যান,

সেনাবাহিনীর একটা এম. আই রুম আছে। ওখানে ডাক্তার ও ওষুধ পাওয়া যাবে মনে হয়। ওখানে একটা খবর দিন, হয়তো স্ট্রেচারও পেয়ে যাবেন। স্ট্রেচার ছাড়া ওকে শহরে পাঠানো অসম্ভব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা স্ট্রেচার আর ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে একজন নার্সিং অর্ডার্লি এসে উপস্থিত হলো সমাজপতি আর বিষ্ণুর সঙ্গে। ওরাই এম. আই. রুমের খোঁজে গিয়েছিল। নার্সিং অর্ডার্লি বিকাশকে পরীক্ষা করে বলল, 'বোধহয় পায়ের গোড়ালি মচকে গিয়েছে, কোমরেও চোট লেগেছে।' সঙ্গে সঙ্গেই সে বিকাশের কাদা-মাখা শরীরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেললো, ছড়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া জায়গায় একটা লাল ওষুধ মাখিয়ে দিল, একটা লোশনে ভিজিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল পায়ের গোড়ালীতে, ভেজা প্যাণ্ট সার্ট-সোয়েটার একটা ধুতি ভাঁজ করে পরিয়ে দিল, আর কম্বলে মুড়ে স্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে দিল বিকাশকে।

লামাবাবু বললেন, 'কিন্তু এখন কি করে ওকে শহরে পাঠানো যায়?'

সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। বিকাশকে শহরে নিয়ে যাওয়া মানে ফিরে যাওয়া। কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চায় না। ফিরে যাওয়া মানে আবার বদ্ধ হয়ে যাওয়া, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। সত্যেন এগিয়ে এসে বললো, 'আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি।'

লামাবাবু বললেন, 'আপনি একা তো আর স্ট্রেচার নিয়ে যেতে পারবেন না। আরও লোক চাই।'

নার্সিং অর্ডার্লি মোহন সিং এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। ফার্স্ট এইড বক্স গুছিয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো; 'আপনাদের অসুবিধা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের এম. আই. রুমেও লোক কম। সব সময় এদিক-ওদিক থেকে ডাক আসছে, নতুবা আমরা হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারতাম।

এই বলে সে ইতিমধ্যে কাছাকাছি বসতি থেকে যে-সব ছেলে-

ছোকরারা জড়ো হয়েছিল সেদিকে তাকাল। ওদের একজনকে ডেকে বললো, স্ট্রেচারে এই রোগীকে শহরে নিয়ে যেতে। বাবুরা এই জন্যে বকশিস্ দেবে।

অর্ডার্লি সেনাবাহিনীর লোক বলেই হোক, অথবা সমস্ত পরিস্থিতি-টা মোটামুটি বুঝতে পেরেই হোক, প্রথম একটু ইতস্ততঃ করবার পরে ওরা কয়েকজন রাজি হয়ে গেল। বিকাশ এতক্ষণ চোখ বুজে শুয়েছিল, সবই শুনতে পাচ্ছিলো। বাড়ি ফেরা এখুনি তার আর হলো না। দেখা হলো না আলগাড়া লাভা গরুবাথানের পথ। সমস্ত শরীরে অস্বস্তি আর যন্ত্রণা নিয়ে সে এইটুকু মাত্র ভাবতে পারলো, আর মনে মনে শহরে ফিরে যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলো। পথে সঙ্গে নারী ছিল বলেই এই দুর্ঘটনা কিনা, এই নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু চিন্তা করতে পারছিল না সে।

রেণু কাছে এসে বললো, 'তোমার সেরে উঠতে উঠতে রাস্তাঘাট খুলে যাবে, কাজেই তুমি কোন ভাবনা কোরো না বিকাশ।'

ব্যস, ওই পর্যন্ত। বিকাশ কোনো উত্তর দিল না, তাকালো না। বেড়াতে এসে সবাই এক সঙ্গে হয়েছিল, এক সঙ্গে ফিরছিল বাড়ির পথে, এখন সেই সঙ্ঘ ভেঙে গেল। বিকাশকে নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন শহরের পথে ফিরে গেল, সঙ্গে গেল সত্যেন। আর সবাই লামাবাবুর নেতৃত্বে এগিয়ে গেল। কিন্তু সকালের সেই আনন্দ উৎসাহ ইতিমধ্যে যেন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।

তুমি এখন কেমন বোধ করছো? দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করছিলেন।

ভালো। সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল বিকাশ।

এই অবস্থায় তুমি কি কাল কলকাতা যেতে পারবে?

কলকাতা? কাল? বিকাশ উদ্দীপ্ত হতে হতে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল; আমার এই অবস্থায় আপনি ঠাট্টা করতে পারলেন?

দাশগুপ্ত একটু হেসে বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে ঠাট্টা করতে

পারি? তোমার কি তাই মনে হলো? . শোনো, সত্যিই তোমাকে কালই কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী গাড়ী এসে এখান থেকে তোমাকে ছুপিণদাড়া নিয়ে যাবে, সেখান থেকে হেলিকপ্টারে যাবে শিলিগুড়ি।

বিকাশ অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়েছিল দাশগুপ্তর দিকে; এই রকম কোনো ব্যবস্থা যে এত তাড়াতাড়ি কখনো সম্ভব হতে পারে, তা তার কল্পনাতে ছিল না। সত্যেন কাছে ছিল। সে দাশগুপ্তর কথাটা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল; হেলিকপ্টার? আপনি সত্যি বলছেন মিঃ দাশগুপ্ত?

দাশগুপ্ত একটু বিরক্ত হয়েছিলেন, সত্যেনের কথার কোনো উত্তর দিলেন না। বিকাশকে বললেন, শিলিগুড়ি অবধি তোমাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে তুমি কেমন করে যাবে সেটা তোমার ব্যাপার। ট্রেন যদি চলে, তোমার অসুবিধে হবে না, নইলে ওখানে গিয়ে না আবার স্ট্রাণ্ডেড হয়ে পড়ো। এখানে অন্তত মোটামুটি চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বিকাশ বোধহয় এসব কিছু ভাবছিল না; লামাবাবুদের সঙ্গে যেতে না পারার যে অভিমান মনের মধ্যে জমাট বেঁধেছিল, তা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। সব ঠিক মত হলে রেণুদের আগেই সে কলকাতা পৌঁছে যাবে ভাবতেই তার ভাল লাগল। এমনিতেই ওদের গরুবাথান পর্যন্ত পৌঁছতে মোটামুটি দুদিনের মত লাগবার কথা. তার ওপর এই সন্ধ্যের সময় শোনা গেল বাগরাকোটের পর পাহাড়ে ধস নেমে করোনেশান ব্রীজের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই অন্তত তিন দিনের আগে শিলিগুড়ি ওদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

মনে একটা খুশির ভাব হলো বিকাশের; দাশগুপ্তর দিকে তাকিয়ে বললো, শিলিগুড়ি পৌঁছতে পারলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই,

সমস্যাটা শিলিগুড়ি যাওয়া নিয়ে। তা আপনারা যে তার এমন ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্যে সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ।

দাশগুপ্ত সস্নেহে হাসলেন। বললেন, 'তাহলে সরকারী মহলের ওপর তোমার ক্ষোভ নেই আর?'

বিকাশ লজ্জিত হলো।

দাশগুপ্ত বললেন, না না, এতে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমাদের দলের অবস্থা তো তখন স্বাভাবিক ছিল না। তুমি বরং এখন বিশ্রাম কর, সারাদিন অনেক ধকল গেছে, আবার জার্নি করবে।

তারপর সত্যেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার আমি চলি ভাই। কাল চুপিণদাড়ায় আবার দেখা হবে, আমি ওখানে থাকবো।

সত্যেন হাত জোড় করে নমস্কার করলো, দাশগুপ্ত প্রতি নমস্কার করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

হোটেলের গেটে একজন সিপাই অপেক্ষা করছিল, দাশগুপ্তকে দেখে বললো, ইনস্‌পেক্টর প্রধান পাঠিয়েছেন।

আচ্ছা চলো।

অন্ধকার এখনও ঘন নয়, কিন্তু সন্ধ্যা বয়ে গেছে। পথ ঘাটে কোনো লোকজন নেই। দাশগুপ্তর ভালো লাগছিল না। শহরের এই দিকটায় বাড়ি ঘরও তেমন নেই, বড় বড় গাছে নির্জনতা বড় ছমছম করে এখানে। আকাশে কুয়াশার আস্তরণ, জ্যোৎস্না প্রবল কথা ছিল আজ, কিন্তু তা-ও নেই। দাশগুপ্ত একবার সিপাহীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটু দূরত্ব রেখে পাশাপাশি পথ হাঁটছে নীরবে।

নীরবতা ভাঙার জন্যেই যেন দাশগুপ্ত কথা বললেন।

তুমি কোথায় থাকো?

ছিব-বস্তীতে, সাব্।

দাশগুপ্ত যেন একটু চমকালেন।

অশোক-কে চেন?

চিনি, সাব্।

তার খোঁজ পাওয়া গেছে ?

নেহি, সাব্।

তোমার কি মনে হয় সিপাইজী, ছেলেটা কোথায় যেতে পারে ?

সিপাহী কোন উত্তর দিল না।

দাশগুপ্ত জানেন, এর কোনো উত্তর নেই। সব কিছুর উত্তর থাকে না। তবু মাঝে মাঝে কিছু কিছু বেয়াড়া প্রশ্ন বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে, এবং অহেতুক অস্বস্তি তৈরি করে যায়।

সূর্য-সদনের বাঁকটা পেরিয়ে খানিকটা এলে সজল রায়ের সঙ্গে দেখা। হাতে টর্চ, গলায় মাফলার। এই নির্জন অন্ধকার রাস্তায় সে প্রায় ছুটে ছুটে নামছিল। খুবই স্বাভাবিক; ভয়ের কিছু না থাকলেও এই রকম পথে এই সময়ে গা একটু ছম ছম করেই। দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়েই বললেন, এ সময়ে শহরের দিকে কোথায় যাচ্ছো ?

চাকরিতে দাদা, সজল বলে : চাকরি করি জানেন তো ?

কালকের হেলিকপ্টারে যে কজন ট্যুরিস্টকে ফেরৎ পাঠানো হবে, তাদের দুজনকে এখনো খবর দেওয়া হয়নি। সজল রায় সেই খবর দিতে তিস্তা ভিউ হোটেলের দিকে যাচ্ছিল।

শুনে দাশগুপ্ত বললেন, 'এই রাতে তোমাকে বোধহয় আমি বাঁচাতে পারি। কি, বাঁচতে চাও ?'

সজল রায়কে সত্যি বাঁচালেন দাশগুপ্ত। সজলকে জানালেন, তিস্তা ভিউ-র বিকাশ ও সত্যেনকে তিনি নিজে খবর দিয়ে এসেছেন। কাজেই সজলকে আর যেতে হলো না। সিপাইকেও দাশগুপ্ত ওখান থেকেই ছেড়ে দিলেন। সজলের কোয়ার্টার তাঁর বাড়ির কাছাকাছি, কাজেই ওর সঙ্গেই তিনি এটুকু পথ চলে যেতে পারবেন।

পাশাপাশি পথ হাঁটতে হাঁটতে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন : কেমন বুঝছো ?

সজল উত্তর দিল : বিরক্তিকর।

কেন ?

এই দেখুন না, কাল সারাদিন ছুর্পিণদাঁড়ায় ডিউটি, কি ঝামেলা বলুন তো ?

দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন না। তাঁর পুলকেশের কথা মনে হলো। পি. ডব্লু. ডি-র সেই ইঞ্জিনীয়ার, যে একদিনের মধ্যে রাস্তা ঠিক করে ফেলবেই জীপ চালাবার জন্য।

এই ছুর্পিণদাঁড়া। কালিম্পঙের দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু সেই জায়গা। ক্যান্টনমেন্ট নিচে রেখে এখানে উঠে আসতে হয়। একটা বৌদ্ধ গুম্ফা, একটি হেলিপ্যাড। এখান থেকে তাকালে দূরে ডুয়ার্সের সমতল-ভূমি চোখে পড়ে। এই প্রখর রোদেও সেখানে পাৎলা কুয়াশার একটা আস্তরণ। তিস্তার গতিপথ দেখা যায়। পাহাড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেবকের কাছে সমতলে নেমে বন্ধনমুক্ত অবারিত তার স্রোত! ডাইনে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, বাঁয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি, মাঝখান দিয়ে তার সমতলমুখী অভিযান। এই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে এতদূর থেকেও বোঝা যায় তিস্তা এখন স্ফীতকায়, অনেকখানি বেড়ে গেছে তার আয়তন, নদীর প্রান্তরেখা বলে কিছু নেই, পাহাড় থেকে বেরিয়ে এখন সে সমতলকে ছোবল মারছে। প্রায় কার্নিশে দাঁড়িয়ে থাকার একটা বোধ হয় এখান থেকে, তিস্তার কার্নিশে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অনিশ্চয়তার বোধ, এই কদিনের অভিজ্ঞতায় কালিম্পঙের হৃৎপিণ্ডে যে বোধ সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

অথচ এখন দেখতে ভালোই লাগছে, নিরাপদ দূরত্বে যখন সে পটরেখা মাত্র। ঝিরঝিরে একটা পুবান হাওয়া বইছে। প্রখর রোদ্রে এক ধরনের আচ্ছন্নতা। গাঢ় নীল আকাশ, কোথাও ছিটে ফোঁটা মেঘ নেই। পেছনে পাহাড়ের চূড়োয় বরফের আয়তন বেড়ে গেছে, সমস্তটা উত্তর জুড়ে এখন তার সাম্রাজ্য, নাথু-লা-কে অনুসরণ করলে

শুধু চোখ দিয়ে তিব্বত-সীমান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। আর এই দূর উচ্চতা থেকে সামনে সমতল দেখলে কখনো মনে হতে পারে, অনেকখানি উঠে এসেছি। আবার এ ক'দিনের অভিজ্ঞতার পর কখনো মনে হতে পারে, ওখানেই জীবন। কত কাছে, অথচ কত দূর।

ওই জীবনভূমি থেকে একটা শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। শব্দ ধীরে ধীরে একটা দৃশ্য হয়ে উঠলো, একটা চলমান কালো বিন্দু ওপারের পাহাড়ের দিকে আসতে আসতে আকারে বড় হতে হতে কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক কাছে এসে গেল একটা হেলিকপ্টারের রূপ নিয়ে। দেখতে দেখতে আধুনিক একটা কলের পাখি এসে নামল হেলিপ্যাডে, ঘুরন্ত রোটারটা থেমে গেল ধীরে ধীরে। ভেতর থেকে রিলিফের জিনিসপত্র নামবে, কুলিরা কাছাকাছি এসে লাইন করে দাঁড়ালো। একটু পরে হেলিকপ্টারের দরজা খুলে গেল।

পাইলট নামল। তাঁর হাতে দুটো প্যাকেট। একটি প্যাকেটে জি ও সি-র জন্য খবরের কাগজ, আরেকটি মোটাসোটা প্যাকেট পানের। পাইলট এগিয়ে এসে সজলকে জিজ্ঞেস করলো, কর্ণেল গাঙ্গুলি কোনো লোক পাঠিয়েছেন?

সজল হেসে বললো, কেন, পান তো? কাল ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছিলেন? আমার কাছে রেখে দিন, লোক পাঠাবেন বলেছেন। আর কাগজের প্যাকেটটাও এখানে দিন, আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

পাইলট প্যাকেট দুটো সজলকে দিয়ে বললো, কফিটফি কিছু?

আপনি বসে একটু বিশ্রাম করুন, কফির জন্য টেম্পোরারি একটা এ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাহ্। বলে পাইলট একটা ফাঁকা চেয়ারে গিয়ে বসলো। ফুড ডিপার্টমেণ্টের তপনবাবু এগিয়ে এসে তার কাছ থেকে রিলিফের জিনিসপত্রের লিস্টটা চেয়ে নিল।

এই সময় পুলকেশ এলো। তাকে গলদঘর্ম দেখাচ্ছিল, বোঝা

যাচ্ছিলো সে প্রায় ছুটতে ছুটতে এই পাহাড়ী চড়াই ভেঙ্গে এসেছে। তপনবাবু কুলিদের তখন মাল নামাবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে, এবং নিজে লিস্ট মিলিয়ে তদারকীর কাজ সবে শুরু করেছে। পুলকেশ তপনবাবুর কাছে এসে বললো, ট্রাক লরি বিকেলের আগে পাবেন না। রাস্তার কাজ শেষ করতে পারিনি। কাজেই জিনিসপত্র এখন নিচে নামিয়ে লাভ নেই।

তাহলে কি করব এখন ?

হেলিকপ্টারটা খালাস করে দিন। মালগুলো একটা ধারে আপাতত জমা করে রাখুন।

তারপর ?

আশা করি বিকেলের আগেই রাস্তা খুলে দিতে পারব। কিন্তু হেলিকপ্টার তো আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে, আরো দুটো ট্রিপ হবার কথা।

তারমানে তিন ট্রিপের মাল এখান থেকে পাঠিয়ে ছুটি পেতে রাত কটা হবে, বুঝতে পারছেন ?

উত্তরে পুলকেশ একটু দুঃখ প্রকাশ করলো।

অসন্তুষ্ট মুখেই তপনবাবু আবার তার তদারকীর কাজে মন দিল। সজল রায় পুলকেশকে কাছে ডাকলো ঃ কফি খান।

পুলকেশ কফিতে চুমুক দিয়ে বললো, আপনার ট্যুরিস্টরা সব এসে গেছে ?

তিস্তা ভিউ হোটেলের দু'জন এখনো আসেনি। ওদেরই তো ফার্স্ট ট্রিপে যাবার কথা।

ওই পা ভাঙা লোকটি তো ? আসছে। পুলকেশ কফির গ্লাস নামিয়ে রেখে বললো, গাড়ি তো এই অবধি এখনো আসতে পারছে না। চারজন কুলি ঠিক করে দিয়েছি, ওরা নিয়ে আসছে।

একটু পরেই বিকাশ আর সত্যেন এসে পৌঁছে গেল। চার জন কুলি একটা স্ট্রেচারে করে বিকাশকে নিয়ে এসেছে। একটা

চেয়ারে বিকাশকে বসিয়ে দেওয়া হলো। তাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। স্বাভাবিক, পুলকেশ ভাবলো।

কিন্তু পুলকেশ ওদের সঙ্গে কোনো কথা বললো না। এগিয়ে গিয়ে তপনবাবুর সঙ্গে কথা বলে সে চলে যাচ্ছিলো। সত্যেনই তাকে ডেকে কাছে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

সত্যি, আপনি কুলি, স্টেচার এসব ব্যবস্থা না করে দিলে, আজকে আমাদের হয়তো যাওয়াই হতো না।

যেখানে রাস্তার কাজ হচ্ছিলো, ওদের নিয়ে একটা জীপ সেখানে এসে আটকে যায়। পুলকেশ স্পটে ছিল, কুলির ব্যবস্থা করা, জিপ ফেরৎ পাঠিয়ে হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচারে আনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সেই করে দিয়েছিল। সেইজন্যে এই কৃতজ্ঞতা।

পুলকেশ বললো, আমাদের কাজ যথাসম্ভব আমরা করে দিলাম, এখন আপনারা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছোন তবেই সব ঠিকঠাক হয়।

বিকাশ তার চেয়ারে বসেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললো, সেসব দেখবেন ঠিকঠিক হয়ে যাবে। এখানে একবার যখন এসে পৌঁছেছি।

তাই যেন হয়। কিন্তু সব সময় যে ঠিক ঠিক হয় না, তা তো এখানে বেড়াতে এসেই বুঝতে পারলেন। কি রকম অভিজ্ঞতা হলো?

দারুণ। আমি লিখতে টিকতে জানি না অবশ্য, কিন্তু সত্যেন জানে। দেখবেন এই নিয়ে ও একদিন ঠিক কিছু লিখে ফেলবে।

সত্যেন হাসলো।

ওর কথা কিছু বিশ্বাস করার দরকার নেই, বুঝলেন। আসলে এই অবস্থায় কলকাতা ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, তাতেই ও খুব খুশি। এটা হতেই পারে, তাই না?

পুলকেশ মাথা নাড়লো।

বিকাশ তার চেয়ার থেকেই গলাটা একটু উঁচু করে বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার?

বলুন।

মিঃ দাশগুপ্ত আসেননি ?

দেখছি না যখন, আসেননি বলতে হবে। তাঁর পক্ষে এখানে পায়ে হেঁটে আসা খুবই কষ্টকর।

বিকাশ একটু থেমে বললো, কিন্তু তিনি আসবেন বলেছিলেন।

সব কাজ যথাযথভাবে হয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টার থেকে মাল খালাসের কাজ হয়ে গেল। পুলকেশ ফিরে যেতে গিয়েও গেল না। সজল রায় টুরিস্টদের তুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হলো। পাইলট উঠে দাঁড়িয়েছে।

হেলিকপ্টারে ওঠার আগে বিকাশ পুলকেশের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললো, চলি ভাই। আপনাদের কথা আমাদের মনে থাকবে। যাবার সময় মিঃ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হলো না। তাঁকে দয়া করে আমাদের কথা বলবেন।

ফার্স্ট ট্রিপের হেলিকপ্টার চলে গেল।

মিঃ দাশগুপ্ত আসেননি।

এরপর অন্তত দু'দিন কালিংম্পঙের পথে দাশগুপ্তকে দেখা যায়নি। কেউ তার খোঁজও করেনি। একদিন সকালের কাজকর্ম তদারকী শেষ করে হঠাৎ পুলকেশ এসে উপস্থিত হলো তাঁর কোয়ার্টারে। কালিম্পঙের হিমেল সকাল শেষ হয়ে এখনও তপ্ত দুপুর আরম্ভ হয়নি।

দাদা, কি ব্যাপার ?

কে, পুলকেশ ? শান্ত গলায় দাশগুপ্ত বললেন, এসো, কফি খাও।

কফি তো খাবই। কিন্তু আপনি হঠাৎ ডুব দিলেন কেন ?

দাশগুপ্ত এর কোনো উত্তর দিলেন না। পুলকেশের গলা পেয়েই বোধহয় দাশগুপ্তের স্ত্রী শোভনা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

পুলকেশ জিজ্ঞাসা করলো, বৌদি, দাদার কি হয়েছে ?

শোভনার মুখে একটা অস্বস্তি ছিল। তাঁর এই রকম মুখ দেখতে পুলকেশ অভ্যস্ত নয়। ফলে তার নিজেরও অস্বস্তি বোধ হলো। ওরই মধ্যে আবার বললো সে, কি হয়েছে, বৌদি ?

তোমার দাদা কিছু বলেননি ?

পুলকেশ মাথা নাড়লো। সে জানালো যে সেদিন দুপুরের পর বিকাশদের হেলিকপ্টারে যখন পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তখন দাশগুপ্ত সেখানে থাকবেন বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিন দুপিণদাঁড়া যাননি। তারপরও আজ কয়েকদিন তাঁকে বাইরে কেউ ছাখেনি। তাই সে খোঁজ নিতে এসেছিল।

গাড়ি বারান্দায় বসেছিল ওরা। দাশগুপ্ত হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, 'তোমরা একটু কথা বলো, আমি আসছি।' এই বলে যেন হঠাৎ, কিছু একটা আড়াল করবার জন্যেই যেন, একটা অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে তিনি ঘরের ভেতর চলে গেলে।

শোভনা এতক্ষণ বসেননি, এবার বসলেন।

পুলকেশ বললো, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, বৌদি।

শোভনা মাথা নাড়লেন; নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। সেদিন তিনি দুপিণদাঁড়া যাননি, যাবার মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। সকালবেলা বেরিয়েছিলেন, দুপুরে ফিরে এলেন থমথমে মুখ নিয়ে, বললেন, আমি কিছু খাব না শোভনা; আমার কিছু ভালো লাগছে না। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেদিন সকালে সোমনাথের সঙ্গে রিলিফ ক্যাম্প দেখতে গিয়েছিলেন দাশগুপ্ত। কিছু গৃহহীন অসহায়কে নিয়ে স্কোয়াড-মাস্টাররা কিছুই করতে পারছিল না বলে তাড়াতাড়ি দুটো রিলিফ-ক্যাম্প খুলতে হয়েছিল; সেখানে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে স্কোয়াড-মাস্টাররা চাইছিল সোমনাথ একবার ক্যাম্পে যেন ঘুরে যান। দাশগুপ্ত সেটা জানতেন। সেদিন সকালে হঠাৎ এক সিপাই এসে জানালো, এস. ডি. ও সাহেবের ইচ্ছে দাশগুপ্ত সাহেব তাঁর সঙ্গে ক্যাম্পে যান।

অফিসে রামকুমার উপস্থিত ছিল, তাকে ছোটোখাটো দু-একটা নির্দেশ দিয়ে সিপাই-র সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন দাশগুপ্ত।

সোমনাথ বেরোবার মুখে দাশগুপ্ত এলেন। সোমনাথ বললো, কিছু মনে করেননি তো দাদা ? কেন বলতে পারবো না, আমার বার বার মনে হলো, আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। তবে আপনার একটু পরিশ্রম হবে।

দাশগুপ্ত হেসে বললেন, আমি থাকলে আলাদা করে ভালো আর কি হবে বলো ? যা পরিশ্রম-করবার, ভালো করার, সবই তো তোমরাই করছ। তা কোন্ ক্যাম্পে যাচ্ছ ?

তা মাইল দুই নামতে হবে তিস্তার দিকে। নামার সময় শর্টকাটে খাড়া নেমে যাবো, ফেরার পথে নয় বড় রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে আসা যাবে, পরিশ্রম কম হবে।

দু'জন সিপাই আর ইন্সপেক্টর প্রধানকে নিয়ে সোমনাথ ও দাশগুপ্ত বেরিয়ে পড়লেন। ঝকঝকে দিন ; ঠাণ্ডা আছে, আর রোদে গরমও আছে। পায়ে চলা পথ মাঝে মাঝেই ভাঙা, কোথাও মাটি খসে গেছে, কোথাও পাথর গড়িয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে অত্যন্ত সাবধানে নামতে হচ্ছে। 'একটা করে লাঠি সঙ্গে থাকলে ভালো হতো,' দাশগুপ্তর কথাটা একবার মনে হলেও কিছু বললেন না। সামনে কয়েকটা ইউক্যালিপটাসের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে বন্য চেরীর ঝাঁক। মাঝে মাঝে দু-চার জন লোক দেখা যাচ্ছে, মন্থর ঘর-সংসারের কাজ ছন্নছাড়া ভাবে শুরু হয়েছে কোথাও, বোঝা যাচ্ছে। দুদিন আগে হলে এই ছবি দেখা যেত না, দাশগুপ্ত জানেন। আর ঠিক এইসময় দূরে রামপ্রসাদ ছেত্রীর বাড়িটা তাঁর চোখে পড়লো : কেন চোখে পড়তে গেল ঐ বাড়িটা ? রামপ্রসাদ কি এখনো তাঁর ঘরে ঠিক ওই ভাবে নিথর হয়ে বসে আছেন ? দাশগুপ্ত জানেন, তা কখনো হয় না। নিশ্চয়ই তাঁর ঘরের সব জানালা এখন খোলা, ঘরে এখন প্রচুর আলো, তাঁর স্ত্রী গৃহস্থালীতে ব্যস্ত, এবং—।

ধীরে ধীরে সবই স্বাভাবিক হয়ে আসছে, এ হতেই হবে,—সোমনাথ চলতে চলতে দাশগুপ্ত-র দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, ওই দেখুন দাদা, দু'জন লোককে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে মকাই ক্ষেতে!

দাশগুপ্ত দেখলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। হরিশ প্রধান জানালেন যে আজ আসবার আগে হাটের দিকটায় কিছু আরুচা মকাই আর রাইশাক্ দু-একটা বিচ্ছিন্ন দোকান বসতে তিনি দেখে এসেছেন।

অশোকের দিদিমার কান্নাও তাহলে এখন শুকিয়ে এসেছে, দাশগুপ্ত একবার ভাবলেন। কিন্তু উমাশঙ্করজী এখন কি করছেন? পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন এখনো সেই বিলাসী সাহিত্যিক? কিন্তু রত্না? উমাশঙ্করের মেয়ে? সে কি এখনো ঘরের বাইরের বাগানে এসে একবার দাঁড়ায়নি? কালিকাপ্রসাদের বাপ এখন কি করছে?

হোসিয়ার!

সিপাই দু'জন আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছিলো। একটু পেছনে যাচ্ছিলেন হরিশ, সোমনাথ আর দাশগুপ্ত। সিপাই-র চিৎকারে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন! কিন্তু একমুহূর্ত; হরিশ প্রধান সঙ্গে সঙ্গে ছুটে নেমে গেলেন সিপাইদের দিকে একটু দূর থেকে দাশগুপ্তরা দেখলেন, সিপাইরা হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইন্সপেক্টরকে কি দেখাচ্ছে, আর উত্তেজিতভাবে কিছু বোঝাচ্ছে।

সোমনাথ আর দাঁড়ালো না।

দাদা, আসুন, এই বলে সে ওদের দিকে পা বাড়ালো ঃ নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।

দাশগুপ্তও পেছনে পেছনে এলেন। সরু পায়ে-চলা পথ, সামনের দিকটা অনেকখানি ধসে নেমে গেছে। এই পথে আর এগোবার উপায় নেই। এই দিকটায় লোকজনও নেই, একটু রুক্ষ, পরিত্যক্ত জায়গার মতো অনেকটা। আর এখানেই পর পর কয়েকটা বন্য চেরীগাছ অক্টোবরী ফুলে ছেয়ে আছে। একটু আগে ওপর থেকে এই ফুলগুলো

দেখে এসেছেন দাশগুপ্ত।

চেরী গাছের ঠিক নিচেই পর পর কয়েকটা ছোটো মাপের পিপলি গাছ। হরিশ এইরকম একটা পিপলি গাছের দিকে সোমনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ওই গাছের একটা ডালে একটি মৃতদেহ ঝুলছে। দাশগুপ্ত তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। গত কদিন যাবত তিনি এতগুলি বিকৃত মৃত্যু দেখেছেন, কিন্তু আজ কিছুতেই এই দৃশ্যের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলেন না।

না, এ কোনো খুনের ঘটনা নয়,—হরিশ বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বোঝালেন সোমনাথকে। সিপাইরা একটু দূরেই একটা ধসের জায়গা দেখালো। পাহাড়ের এই পরিত্যক্ত অংশে কোনো বসতি নেই বলেই জানা ছিল, কিন্তু এখন দেখা গেল, অন্তত একটা কুঁড়েঘরে অন্তত একটা পরিবার বাস করতো। ধসে নেমে গেছে সেই বাড়িটা, কয়েকটা বাঁশ আর ছাউনির একটা অংশ বিধ্বস্ত অবস্থায় কিছুটা দূরে পড়ে রয়েছে। বোঝা যায়, ওই বাড়িটার ইতিহাসই পিপলি গাছের নিচে এসে ঠাঁই নিয়েছে। যে গাছে মৃতদেহটি ঝুলছিল, তার গোড়ায় একটি স্ত্রীলোক ও একটি বৃদ্ধের কাদামাখা বিকৃত শব শায়িত। শবের ওপর বুনো ফুল ছিটনো। স্বজনকে ধসের ভেতর থেকে উদ্ধার করে এনেছিল লোকটা, তারপর সেই অসহায় মৃত্যুর ওপর আক্রোশেই বোধহয় আত্মহত্যা করে।

দাশগুপ্ত একটা পাথরের ওপর বসে পড়েছিলেন। লোকটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওই বিধ্বস্ত বাড়ি থেকেই সে দড়ি সংগ্রহ করে এনেছে, আত্মহত্যাই সে করতে চেয়েছিল। সে তো বাঁচতেও চাইতে পারতো।

দাশগুপ্তর চোখের সামনে চেরী ফুলের প্লাবন। হঠাৎ তার মনে হলো, জিৎ বাহাদুর বাঁচতে চেয়েছিল। রামপ্রসাদ ছেত্রীর সেই বন্ধু ধসের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলেছিল, ডুরি, ডুরি। সে দড়ি চেয়েছিল মৃত্যুর ভিতর থেকে জীবনে উঠে আসবার

জন্যে। কিন্তু সে দড়ি পায়নি, জীবনে ফিরে আসতে পারেনি। আর এই লোকটা? সে মরীয়া হয়ে দড়ি খুঁজে আনলো জীবন থেকে মৃত্যুতে যাবার জন্যে?

দাশগুপ্ত আর ভাবতে পারলেন না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সোমনাথ, আমাদের বোধহয় আর দেরী করা উচিত নয়। ক্যাম্প হয়ে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।'

সোমনাথও অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সে কি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল? এবং এই প্রথম? দাশগুপ্তর অন্তত তাই মনে হলো। কিন্তু কেন?

দাশগুপ্ত সোমনাথের কাঁধে হাত রাখলেন: তুমি এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে চলবে কেন, সোমনাথ?

কিছু ভালো লাগছে না, দাদা, অনেকক্ষণ পর দাশগুপ্তর কথার উত্তরে সোমনাথ কথা বললো: আর ভালো লাগছে না।

কিন্তু তোমাকে তো এখন ক্যাম্পে যেতে হবে।

সোমনাথ মাথা নেড়ে হরিশকে বললো, প্রধান, এখানে থেকে আর কোনো সোজা পথ আছে যাতে ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি পৌছনো যায়? এই পথে তো আর যাওয়া যাবে না।

হরিশ বললেন, একটু ঘুরে যেতেই হবে স্যর, তবে সময় বেশি লাগবে না। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা কি করব?

সে আপনি যা হয় একটা কিছু করুন, আমি আর ভাবতে পারছি না, প্রধান। সোমনাথ অসহায়ভাবে হরিশের দিকে তাকিয়ে কথা কটি বললো মাত্র। হরিশ প্রথমে একটু অবাক হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিপাইদের কাছে ডাকলেন।

হরিশের কথা অনুযায়ী স্থির হলো, সিপাই দু'জন এখানে থাকবে আপাতত। ক্যাম্পে গিয়ে স্কোয়াড মাস্টারকে ওঁরা সব বলবেন, স্কোয়াড মাস্টার লোকজন পাঠিয়ে দেবে। করবার কিছু নেই; শব দুটোর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করা, আর আত্মহত্যা করা লোকটার

দেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া। পোস্ট-মর্টেম ছাড়া ওই ডেডবডি ছাড়া যাবে না।

সিপাইরা ওখানে রয়ে গেল; প্রধানরা একটু ওপরের দিকে এলেন আবার, তারপর অন্যপথ ধরে ক্যাম্পের দিকে নামতে থাকলেন। পথ চলতে চলতে এখন আর কেউ কোনো কথা বলছিলেন না, ক্যাম্পের মুখে এসে শুধু সোমনাথ একবার কথা বললো।

আমার একটা ইচ্ছে আছে, প্রধান। পারলে, রাখবেন।

বলুন, স্যর।

পোস্ট মর্টেম হয়ে গেলে ওই লোকটার ডেডবডি অন্ত্যেষ্টির জন্যে ওখানেই পাঠিয়ে দেবেন। ওই দুটো শবের কাছাকাছি ওকে থাকতে দিন।

হরিশ মাথা নাড়লেন: তাই হবে, স্যর।

দাশগুপ্ত একবার চমৎকৃত হয়ে সোমনাথের দিকে তাকালেন। দাশগুপ্তর মনে হলো সম্পূর্ণ অপরিচিত এক সোমনাথ।

ক্যাম্পে এসে প্রথমেই হরিশ সেই পিপলি গাছগুলোর ওখানে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। স্কোয়াড-মাস্টার প্রথমে আপত্তি করেছিল, কারণ তার হাতে লোকজন কম। কিন্তু সোমনাথ হস্তক্ষেপ করলো সঙ্গে সঙ্গে। হরিশও স্কোয়াড-মাস্টারকে কথা দিলেন, ক্যাম্পের লোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাম্পেই ফিরে আসবে, শহরে ফিরে গিয়ে তারা ওখানে অন্য লোক পাঠিয়ে দেবে।

কয়েকটা তাঁবু খাটিয়ে এই অস্থায়ী ক্যাম্পটা খুব তাড়াতাড়ি খুলতে হয়েছিল। কয়েকটা তাঁবু, কিছু কম্বল, আর সামান্য কিছু শুকনো খাবার হাতে নিয়ে। এই দুদিনেই ব্যবস্থা অনেকটা ভালো করা গেছে, প্রয়োজন মতো অষুধ দেওয়া যাচ্ছে, চাল ফোটানো হচ্ছে খাবার জন্যে, ঝোরা থেকে আনা খাবার জলে ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে।

শহর থেকে তিস্তার দিকে বেশ খানিকটা নেমে এলে এই জায়গাটা। একটু রুক্ষ, গাছপালা কম, কোথাও কোথাও একটু পাথুরে। নিচের দিকে তাসিডিং বনভূমি, অন্যদিকে মুখোমুখি সিকিম পাহাড়। তিস্তার দিক থেকে উঠে আসছে চমৎকার হাওয়া।

অফিস-তাঁবুতে সোমনাথকে নিয়ে গেল স্কোয়াড-মাস্টার। সঙ্গে দাশগুপ্তও গেলেন। কিন্তু একটু পরেই দাশগুপ্তর মনে হলো তাঁর সেখানে না থাকাই ভালো। সোমনাথের সঙ্গে স্কোয়াড-মাস্টারের সরকারী কিছু কথা থাকতে পারে। কথাটা মনে হতেই তিনি উঠে পড়লেন। সোমনাথ তাঁর দিকে চেয়ে বললো, দাদা উঠলেন যে ? বসুন।

দাশগুপ্ত বললেন, না। তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের কাজের কথাগুলো সেরে নাও। অনেক বেলা হয়ে গেল। আমি বরং বাইরে ক্যাম্পটা ঘুরে ফিরে একটু দেখি।

দাশগুপ্ত বাইরে বেরিয়েই দেখলেন হরিশ এদিকে আসছেন। দাশগুপ্ত একটু দাঁড়ালেন। হরিশ কাছে এসে বললেন, তিনজন লোক শেষ পর্যন্ত পাঠাতে পারলাম। স্যর কি স্কোয়াড-মাস্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন ?

দাশগুপ্ত মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

তাহলে আর ওখানে গিয়ে ডিস্টার্ব করবো না। আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। আপনি বরং এদিকে আসুন।

কি ব্যাপার, ইন্সপেক্টর ?

আসুন না, একটা অদ্ভুত ঘটনা আপনাকে দেখাই।

দাশগুপ্ত হরিশের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন।

চার নম্বর তাঁবুটার পেছনের দিকের পাথুরে ঢালে একটা মাঝারি গোছের গাছ। তার নিচে কয়েকজন লোক, বাচ্চাই বেশি। তাদের মুখে বেশ একটা মজার ভাব। কেউ কেউ খিল খিল করে হাসছে। ওরই মধ্যে একজন গাছের দিকে তাকিয়ে অনুনয় করে বলছে : নেমে আয়, উষা, নেমে আয়।

দাশগুপ্ত দেখলেন, একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক গাছের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলো। নিচের লোকটি এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরতেই ঝট্‌কা মেরে তার হাতটা সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার গাছ বেয়ে ওপরে উঠে গেল। আঁটসাট করে শাড়ি পরা, কোমরে আঁচল জড়ানো। ওপরে উঠে গিয়ে একটা ডালে বসলো। নিচ থেকে সেই লোকটা আবার ডাকলো : নেমে আয়, উষা নেমে আয়। স্ত্রীলোকটি আবার নেমে এলো। নেমেই আবার উঠে ডালে বসলো। লোকটি আবার ডাকলো। কিন্তু স্ত্রীলোকটি এবার আর নেমে এলো না। একটি ডালে জড়োসড়ো হয়ে বসে গাছের কাণ্ডটি দুহাতে আঁকড়ে ধরলো। চোখ তার ভয়ে বিহ্বল, সমস্ত মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ। চারদিকে চেয়ে কি যেন দেখছে, কি যেন খুঁজছে।

নিচের লোকটি গাছের গোড়ায় একটা পাথরের ওপর বসে পড়লো। গাছের ওপরে আতঙ্কিত ওই স্ত্রীলোকটির দিকে অসহায়-ভাবে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু আর ডাকলো না। একটু পরে মেয়েটি নিজে থেকেই গাছ থেকে নেমে এলো, আবার উঠে গেল। যেসব বাচ্চারা এই দৃশ্য মজা করে দেখছিল, তারাও যেন এর মধ্যে আর কোনো মজা পেল না, একটু পরেই সব চলে গেল তাঁবুর দিকে। জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেল। গাছের ওপরে একটি অস্বাভাবিক স্ত্রীলোক, নিচে পাথরের ওপর বসে থাকা একটি অসহায় মানুষ, প্রখর রোদ, নীল আকাশ, কিছু হাওয়া যা ফার্ণের জঙ্গলের দিকে তাকালে বোঝা যায়।

দাশগুপ্ত একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, বললেন, আমাদের বোধ-হয় এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো, ইন্সপেক্টর। আমার আর এসব দেখতে ভালো লাগছে না।

হরিশ তৎক্ষণাৎ বললেন, চলুন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন।

কটু এগিয়ে বললেন, আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে এই ঘটনাটা

দেখাতে এনেছিলাম মিঃ দাশগুপ্ত। এই ক'দিন তো কত বীভৎস ব্যাপার দেখলেন, কত মৃত্যু, কত বিপর্যয়; কিন্তু এ-রকমটি আর দেখেননি। মৃত্যুর চেয়েও কোনো কোনো ঘটনা কত বেশি শোচনীয় হতে পারে, তা নিজের চোখেই দেখলেন তো।

দাশগুপ্তর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কোনো মৃত্যুর দৃশ্য নয়, তবু এই দৃশ্য দেখাবার জন্য হরিশ তাঁকে ডেকে আনলেন কেন? এখানে আসবার সময় পিপলি গাছে ঝুলে থাকা সেই মৃতদেহটির দিকে তিনি তাকাতে পারেননি, এমন কি সোমনাথও কেমন বিচলিত হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই দৃশ্য তিনি দেখলেন, এবং এখন তাঁর মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত শরীরে কি রকম অস্থিরতার ভাব হচ্ছে একটা।

আপনার শরীরটা কি খারাপ লাগছে? হরিশ যেন বুঝতে পেরেই দাশগুপ্তর পাশে চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ঠিক ভালো লাগছে না, ইন্সপেক্টর। কোথাও একটু বসা যায়?

হরিশ দাশগুপ্তর হাত ধরে স্টোরের তাঁবুটার পাশে যে সামান্য ছায়া ছিল, সেখানে নিয়ে এলেন। দাশগুপ্ত সেই ছায়ায় এক টুকরো পাথরের ওপর বসলেন। হরিশ বললেন, আপনাকে অপিসের তাঁবুতে নিলাম না বলে কিছু মনে করবেন না দাশগুপ্ত সাহেব। এস. ডি. ও. সাহেব আপনাকে এইভাবে দেখলে আরো ভেঙে পড়বেন। আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি বরং দেখি একটু চা পাওয়া যায় কিনা।

দাশগুপ্ত কোনো উত্তর দিলেন না। হরিশ চলে গেলেন। ব্রেক ডাউন? একেই ব্রেক ডাউন বলে? দাশগুপ্তর একবার যেন তাই মনে হলো। আজ তাঁর এখানে আসবার কোনো কথাই ছিল না। হঠাৎ সোমনাথ ডেকে পাঠালো। এইরকম হবে বলেই বোধহয় তাঁকে আসতে হলো। সোমনাথের ডেকে পাঠানোটা নিতান্তই একটা উপলক্ষ্য।

এখান থেকে ওই গাছটা দেখা যায় না। একটা তাঁবুর আড়াল

পড়েছে, আর তাঁবুটাও একটু উঁচু জায়গায়। কিন্তু দৃশ্যটা কিছুতেই তিনি ভুলতে পারছেন না; তার মনে হচ্ছে চোখের সামনেই সেই গাছটা; একটা ডালে বসে একটি স্ত্রীলোক দুহাতে গাছের কাণ্ডটা জড়িয়ে ধরে আছে, মুখে তার অস্বাভাবিক আতঙ্ক আর একটা অদ্ভুত নরম গলায় প্রায় প্রার্থনার মতো করে কে বলে যাচ্ছে : নেমে আয়, ঊষা, নেমে আয়।

এই সময় হরিশ দুহাতে দু কাপ চা নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। দাশগুপ্তর মনে হলো একটা দুঃস্বপ্নের আক্রমণ থেকে তিনি বেঁচে গেলেন। হরিশের হাত থেকে তিনি চা নিলেন, হরিশও তাঁর পাশেই আরেকটা পাথরের ওপর চা নিয়ে বসলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে দাশগুপ্ত বললেন, ওই মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে, তাই না, ইন্সপেক্টর ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। ক্যাম্প এ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে ঘটনাটা শুনলাম।

চা খেতে খেতেই হরিশের কাছে ঘটনাটা শুনলেন দাশগুপ্ত। তাঁর যা মনে হয়েছিল, ঠিক তাই। পরিণাম।

ওকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন ওদেরই বাড়ির পেছন দিকে একটা বিরাট গাছের ওপর চুপটি করে বসেছিল মেয়েটি। ওর স্বামীও ওর সঙ্গেই ওই গাছে উঠে বেঁচেছিল। ভোর হতে স্বামী গাছ থেকে নেমে আসে, ধসে নেমে যাওয়া বসতির দিকে ছুটে যায়। কিন্তু নিশ্চিহ্ন বসতিতে সে কি খুঁজবে ? ওদের খবরটা একটু ওপরের দিকে ছিল, নিচের দিকে ধস নামতেই, চিৎকার কোলাহলের মধ্যে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে ওরা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘর সহ সমস্ত জায়গাটা নিচের দিকে নেমে যায়। কাছেই একটা বিরাট গাছ দেখে সেই গাছে কোনক্রমে উঠে যায় ওরা, কিন্তু ওদের ঘরের সঙ্গে বিছানায় ঘুমন্ত শিশুটিও যে কোথায় তলিয়ে গেল, সেই খেয়াল তখন তাদের ছিল না। বোধহয় এই রকম হয়, ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবার সময় সেই ঘুমন্ত

শিশুটির কথা তাদের একবারও মনে হয়নি; আর যখন মনে হয়, তখন কিছু আর করবার ছিল না।

হরিশ বললেন, জানেন দাশগুপ্ত সাহেব, সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা কি? ওই কোলের বাচ্চাটি ধসে তলিয়ে গেছে, তা নিয়ে ওই মেয়েটির কোন নালিশ বা কান্নাকাটি নেই। সে ওই গাছে আতঙ্ক-গ্রস্ত মুখ নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। ওকে যখন শেষ পর্যন্ত নামিয়ে আনা হলো এবং এই ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো, তখন থেকেই ওই গাছটাতে একবার সে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে। তার শিশুটি যে তলিয়ে গেছে, সেই বোধও বোধহয় তার নেই। কারো সাথে কোনো কথা বলে না, সারাদিন কেবল ওই গাছে ওঠে আর নেমে আসে। স্বামী বেচারা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দু-বেলা খাওয়ায়, রাতে শোবার জন্যে ক্যাম্পের ভেতর নিয়ে যায়, কিন্তু মাঝরাতে কখন যে আবার ওই গাছে উঠে গিয়ে বসে থাকে, কেউ জানতেও পারে না। স্বামী যখন টের পায়, তখন ছুটে যায় ওই গাছের কাছে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার নিয়ে আসে, আবার পালায়।

একটু থেমে হরিশ আবার বললেন, সমস্ত ক্যাম্পে এ ছাড়া অন্যরকম আরো দু-চারটে অদ্ভুত কেস আছে। এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে এই সব নিয়েই আলোচনা করছেন স্কোয়াড মাস্টার। আমি বলে এসেছি, আপনারা আলোচনা করে ঠিক করুন কি করা যায়, কিন্তু স্যরকে মুখোমুখি এ-সব দেখাবার দরকার নেই।

কিন্তু দাশগুপ্ত সম্ভবত অন্যকথা ভাবছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ইন্সপেক্টর, এই কেস্-টার কি হবে? এর কি কোন রিমেডি নেই?

রিমেডি কি বলা শক্ত,—হরিশ একটু অনিশ্চিতভাবেই কথাটা বললেন, শুনেছি স্কোয়াড-মাস্টার ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, এস. ডি. ও. সাহেবকে সে কথাই তিনি বলছিলেন। ডাক্তারের

ধারণা, এটা একটা সাময়িক বিকার, চেষ্টা করলে সেরে যেতেও পারে। ওকে কোনো মেণ্টাল সেণ্টারে নিতে হবে বোধহয়; অথবা এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে উঠে বসবার মত গাছ নেই, বা বাড়ি বা ছাদ নেই। এবং কনস্ট্যাণ্ট নজর রাখতে হবে। কিন্তু এক্ষুণি তা কি করে হবে বুঝতে পারছি না। রাস্তাঘাট চলার অনুপযুক্ত, ওকে এখান থেকে সরানো ব্যাপারটাই তো অসম্ভব হবে।

অর্থাৎ এইভাবেই থাকতে হবে? থাকতেই হবে।

এই কদিনে কত মৃত্যু দেখেছেন দাশগুপ্ত, অসহায় মৃত্যুপুঞ্জ। কিন্তু নিরুদ্দেশ অশোক, আশোকের দিদিমার কান্না, পিপলি গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ, গাছের ডালে পালিয়ে থাকা আতঙ্কগ্রস্ত এই স্ত্রীলোক?

কোনটা শোক?

কোন্‌টা শোক, পুলকেশ? দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

পুলকেশ কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

ইতিমধ্যে বাইরে এসে একটা চেয়ারে বসেছিলেন দাশগুপ্ত। কিছুই ভালো লাগছিল না। সেদিনকার ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার পর থেকে কিছুতেই মনকে স্থির করতে পারছিলেন না। আচরণে মাঝে মাঝে অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছেন, ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছিলেন। কখনো কখনো মনে হচ্ছিলো যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে। বাইরের লোকের পক্ষে ভুল বোঝা স্বাভাবিক। পুলকেশ যদি তাঁর আজকের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়, হতেই পারে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর উচিত নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া, এবং সেই জন্যেই, অনেকটা চেষ্টা করে, তিনি পুলকেশের কাছে ফিরে এসেছেন একটু পরেই। ভেবেছিলেন, অন্য কোনো কথা বলবেন, সম্ভব হলে কোনো হাল্কা কথা, কিছু ঠাট্টা; কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন,

নিজের ওপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে শোকের কথা বললেন।

কোন্‌টা শোক, পুলকেশ?

পুলকেশ কোনো উত্তর দেয়নি। দাশগুপ্ত ঠিক যে কোনো উত্তর চাইছিলেন, তা-ও নয়। বরং নিজের কাছেই তাঁর অসহায়তার অবস্থাটা যেন ধরা পড়লো। শোভনা একটু অস্বস্তিকরভাবে উঠে গেলেন। সেদিকে তাকিয়েই যেন দাশগুপ্ত নিজেকে একটু শাসন করতে চেষ্টা করলেন। পুলকেশের দিকে তাকিয়ে বললেন; কিছু মনে কোরো না পুলকেশ, আমার শরীর মন কোনোটাই কদিন যাবত ভালো যাচ্ছে না। তা ছাড়া বয়সও তো কম হলো না।

পুলকেশ মাথা নাড়লো। বললো, আপনাকে কদিন না দেখেই মনে হলো যেন আপনি ঠিক সুস্থ নেই। তাই খবর নিতে এসে-ছিলাম। এ কদিন ধকলও তো কম যায়নি।

না, না, ধকল আর আমার কি গেল, বলো? দাশগুপ্ত পুলকেশের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, ধকল গেল সত্যি করে তোমাদের। তোমাদের কথা ভাবলে গর্ব হয়।

একটু থেমে আবার বললেন: জানো, চারদিকে সব দেখে শুনে মনে হচ্ছিলো, মানুষের জন্যে মানুষের সত্যিকারের করবার কিছু নেই, অন্য একটা শক্তি সব কিছু চালাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জন্যে মানুষেরই যে কববার কতো কিছু আছে, তোমরা সবাই মিলে তা দেখালে। আজ সকালেই আমি জীপে করে শহরে গিয়েছিলাম একবার, তোমাকে বলা হয়নি। তুমি কি অমানুষিক কাজ করেছ এ কদিন তা তো নিজের চোখেই দেখলাম।

রাস্তা মেরামতির কাজের কথা বলছেন? পুলকেশ এতক্ষণে যেন একটু সহাস্য হবার অবকাশ পেল: দাদা, সারা বছর তো আড্ডা আর ক্লাব করেই কাটাই, এইটুকু যদি না করি পরকালে কি জবাব দেব বলুন।

জবাব দেবার মতো অনেক জমেছে তোমাদের, কিন্তু আমার

কথা একবার ভাবো তো? চারধারে এতো করণীয় ছিল, অথচ আমি কি করেছি।

দাশগুপ্তর কথায় সহাস্য পুলকেশ হঠাৎ আবার থমকে গেল। দাশগুপ্ত কি আত্ম-বিশ্লেষণ করছেন? কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে চেষ্টা করলো পুলকেশ: এসব কথা আপনি কি যে বলছেন, দাদা? এ কদিন আপনি কি না করেছেন বলুন। আমাদের সঙ্গে কোথায় আপনি ছিলেন না।

ছিলাম; কিন্তু তোমরা জানো, কিছুই আমি করিনি। দাশগুপ্ত বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেলেন: আসলে আমার অক্ষমতা। তবু, তোমাকে বলতে বাধা নেই পুলকেশ, এরই মধ্যে একবার চেষ্টা করেছিলাম কিছু একটা পজিটিভ কাজ করবার, তা-ও শেষ পর্যন্ত পারিনি।

দাশগুপ্ত বোধহয় কিছু বলতে চাইছেন, পুলকেশের মনে হলো।

দাশগুপ্ত সত্যিই কিছু বলতে চাইছিলেন। সম্ভবত তাঁর অক্ষমতার আর এক গল্প।

যেদিন ক্যাম্প থেকে প্রায় বিপর্যস্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, সেদিনকার বিকেলেরই ঘটনা। শেষ বিকেল সন্ধ্যে হয় হয়, কিন্তু অন্ধকার নামেনি। বারান্দার চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন, খুব অবসন্ন লাগছিল। এই সময় নিচে থেকে হঠাৎ সেন্ট্রির গলা ভেসে এলো, মনে হলো যেন সে কাউকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর শোনা গেল একটা কান্না, দাশগুপ্তর সন্দেহ রইল না কোনো বাচ্চা ছেলে কাঁদছে।

দাশগুপ্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে রেলিঙে হাত রেখে নিচের দিকে তাকালেন। যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। একটি বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, আর সেন্ট্রি শক্ত করে তার হাত ধরে রেখেছে।

দাশগুপ্ত হাঁক দিলেন: রণবাহাদুর, কি হলো?

রণবাহাদুর ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, এই ছেলেটি স্যর, কম্পাউণ্ডে ঢুকে এদিক-ওদিক লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

দাশগুপ্ত এক মুহূর্ত কি ভাবলেন, তারপর বললেঃ ওকে নিয়ে এসো তো ওপরে, দেখি ব্যাপার কি।

কিছুক্ষণের মধ্যে রণবাহাদুর ছেলেটিকে নিয়ে এল। ছয়-সাত বছরের ছেলে। তখনও কাঁদছে।

দাশগুপ্ত বললেন, রণ বাহাদুর, ওর হাতটা ছেড়ে দাও।

সেন্টি হাত ছেড়ে দিতেই ধীরে ধীরে ছেলেটির কান্না থেমে এল। কিন্তু ফোঁপানি গেল না।

দাশগুপ্ত রণবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? ওকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানতে পেরেছ?

রণবাহাদুরের কাছ থেকে জানা গেল, ছেলেটির বাড়ি পল্লীগ্রামে, বাবা ধস চাপা পড়ে মারা যায়, মার সাথে একটা রিলিফ ক্যাম্পে এসে উঠেছিল। কাল থেকে মা-কেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, খোঁজ করতে গিয়ে শুনেছে ক্যাম্পের একটা লোকের সঙ্গে নাকি পালিয়ে গেছে। কাল রাতে ক্যাম্পে সব লোক যখন ঘুমোচ্ছিলো, তখন এ-ও ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। সকাল থেকে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও মাকে খুঁজে পায়নি। সারাদিন খাওয়াও হয়নি কিছু, অনেক বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, শীতও পড়েছে, থাকবারও কোনো জায়গা নেই; এ-বাড়িতে সে নাকি আশ্রয়ের খোঁজেই ঢুকে পড়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে, কিন্তু ধরা পড়ে গেছে।

রণবাহাদুরের কথা থামতেই ছেলেটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে আবার কেঁদে উঠলো। বলতে চেষ্টা করলোঃ আমি চোর নই। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই জানালো তার খিদে পেয়েছে।

শোভনা কাছেই ছিলেন, গঙ্গাকে বললেন ডেকে, রুটি তরকারি যা হোক কিছু নিয়ে আয় তো তাড়াতাড়ি, এতটুকু বাচ্চা, সারাদিন কিছু খায়নি।

ছেলেটির ফোঁপানি থামেনি। দাশগুপ্ত বললেন, কাঁদ কেন তুমি চোর নও, হলো তো? খিদে পেয়েছে? এক্ষুণি খাবে।

এর মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। এখনো কোথাও ইলেকট্রিকের বাতি নেই, দূরে পাহাড়ের গায়ে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। হিম পড়তে শুরু করেছে, এখন বাইরে থাকা যায় না। দাশগুপ্ত আর শোভনা ঘরে চলে গেলেন। রণবাহাদুরকে ছেলেটিকে নিয়ে ঘরে আসতে বললেন। গঙ্গা একটা কলাই-করা থালায় ছেলেটির জন্য খাবার দিয়ে গেল। ঘরের এক কোণে মেঝেয় বসে ছেলেটি প্রায় গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিল।

সোফায় বসে দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন. সত্যিই তাঁর কিছু করবারই বা কি আছে? রাতের জন্যে নিচে একটা খালি ঘরে ওকে থাকতে দেওয়া যেতে পারে, তারপর কাল সকালে যা হোক কিছু ভাবা যাবে। এরই মধ্যে হঠাৎই যেন তিনি বলে উঠলেন, রণবাহাদুর, তুমি এক্ষুণি হরকাকে একবার ডেকে আনতে পারবে?

পারব, স্যর।

তাহলে তুমি আর দেরি কোরো না। টর্চটা নিয়ে যেও আর সাবধানে যেও, ওদিককার কাঁচা পথ বোধহয় এখনো ঠিক হয়নি।

রণবাহাদুর চলে গেল। আর হরকার আসতে দেরি হলো না।

হরকা এলে দাশগুপ্ত কোনো ভনিতা করলেন না। বললেন, শোনো হরকা বাহাদুর, তোমাকে যে ডেকে পাঠিয়েছি, তার কারণ এই ছেলেটি। একে দেখেই আমার তোমার কথা মনে হলো।

হরকা কিছুই বুঝতে পারছিল না। দেখলো একটি ছোটো ছেলে জড়োসড়ো হয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছে।

দাশগুপ্ত বললেন, তোমার তো কোনো ছেলেপুলে নেই।

হরকা মাথা নীচু করল।

তুমি তো একবার মাইজির কাছে বলেছিলে একটি বাচ্চা পেলে ছেলের মত করে বড় করবে।

হরকা মাথা নাড়লো।

নেবে এই ছেলেটিকে? ওর বাপ-মা নেই, তুমি আর লছমীই ওর বাপ-মা হবে। তোমরাও ছেলে পাবে।

হরকা ছেলেটির দিকে আরেকবার তাকালো। ফুটফুটে ছেলেটি, একটু দুঃখী দুঃখী মুখ। এইরকম একটি ছেলে পেলে নিজের ছেলের মতো করে নিতে তার আপত্তি থাকার কি আছে? সে নিজেই একদিন এইরকম চেয়েছিল। লছমীর চাওয়াটাই বোধহয় আরও বেশি। ওদের আর কোনোদিন ছেলেপুলে হবে না, হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে। সেই থেকে মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করে লছমী। করাই স্বাভাবিক, কোন্ মেয়ে না মা ডাক শুনতে চায়? তা ছাড়া ঘরে ছেলেপুলে না থাকাতে ঘরও খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বুড়ো বয়সের কথা ভাবতে আরও ভয় করে।

এই রকম একটা সুযোগ যে তার জীবনে এমনি করে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে, হরকা তা কোনোদিন ভাবতে পারেনি। অথচ এই রকম ইচ্ছা ছিল। মাইজিকে দু-একবার বলেও ছিল ইচ্ছার কথা লছমীও তো কতবারই না বলেছে। তার ওপর দাশগুপ্ত সাহেব ডেকে এনে তাকে ছেলেটিকে ছেলের মতো নিতে বলেছেন, এটাই কি কম বড় কথা? মানী লোকের কথা, তাছাড়া দরদের কথা।

হরকা আর দ্বিধা করলো না। তার মনে হলো ভগবান হাতে ধরে ছেলেটিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দাশগুপ্ত আর শোভনাকে নমস্কার করে ছেলেটিকে নিয়ে সে চলে গেল।

দাশগুপ্তর মনে হলো একটা কিছু করা গেল। শোভনাকে বললেন, জানো, আজ বড় তৃপ্তি হচ্ছে। চারদিকে ওরা কত কাজ করছে, আমি শুধু ওদের কাজ দেখে গেছি! আজ আমিও ওদের সঙ্গে একটা কাজ করেছি ভাবতে কি যে ভালো লাগছে।

সকালে ক্যাম্পের সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথাও তিনি ভুলে গেলেন। শরীরে যেন সুস্থতা ফিরে এলো। রাতে ভালো ঘুম হলো।

পরদিন সকালে তিনি ব্রেকফাস্ট করতে বসেছেন, গঙ্গা খাবার দিয়ে গেছে, শোভনা টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে চায়ের লিকার ঢালছিলেন। এমন সময় হরকার স্ত্রী লছমী সেই ছেলেটিকে নিয়ে ওপরে উঠে এলো। দরজার বাইরে থেকে হাত জোড় করে নমস্কার করলো।

শোভনা জিজ্ঞেস করলেন: কি ব্যাপার লছমী? কোনো কথা আছে?

লছমী যেন হঠাৎ ফেটে পড়লো।

বললো, আমি ছেত্রীর মেয়ে, ছেত্রীর ঘরের বৌ। আমাদের ছেলেপুলে নেই সত্যি, ভগবান দেননি, দিলে ভালো হতো। এ জন্য মনে দুঃখ আছে, নালিশ আছে, কিন্তু উপায়ও তো কিছু নেই। তাই ভেবেছিলাম একটি ছেলে পেলে নিয়ে নিতাম, নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করতাম। কিন্তু তাই বলে কি এই ছেত্রীর ঘরে কামীর ছেলে রাখা যায়? ধর্ম সইবে না, ভগবান অভিশাপ দেবেন। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই ছেলেকে, একে আমি কিছুতেই রাখতে পারবো না। এই নাও তোমার ছেলে, ফেরৎ দিয়ে গেলাম।

আমার ছেলে? পরিষ্কার বোঝা গেল, শোভনা নিজের রাগ জোর করে সংযত করছেন। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, হরকা কোথায়?

ও নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ও এসে আর নতুন কি বলবে? এই বলে লছমী উত্তেজিতভাবে দ্রুতপায়ে নেমে গেল।

দাশগুপ্ত ব্রেক-ফাস্ট টেবিলের সামনে খাবার নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। শোভনা সেদিকে ফিরে বললেন, তোমার জন্যেই আজ গায়ে পড়ে এই অপমান সহ্য করতে হলো। একটা কিছু কাজ করা গেল বলে তৃপ্তি হচ্ছে, কাল বলছিলে না?

দাশগুপ্ত কোনো উত্তর দিলেন না। এই রকম পরিস্থিতিতে শোভনার পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়া অন্যায় কিছু নয়। আসলে

তাঁর নিজেরই ভুল হয়েছিল। জাত-পাতের ব্যাপারটা তিনি একেবারেই ভেবে দেখেননি। মনেও হয়নি। হরকার দিক থেকেও কথাটা একবার উঠতে পারতো, ছেলেটি কামীর ছেলে কিনা তাও তাঁর জানবার কথা নয়। দাশগুপ্ত বুঝতে পারছেন এই নিয়ে হরকা আর লছমীর মধ্যে কাল রাতে তুমুল কিছু হয়ে গেছে। পিতৃস্নেহের দিক থেকেই পুরুষের মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না, মাতৃস্নেহ লছমীর কম না হলেও সে নারী, সংস্কারের কাছে দায়বদ্ধ।

সমস্ত ব্যাপারটা দাশগুপ্তকে দুঃখিত করলো, কিন্তু লছমীকে তিনি দোষ দিলেন না, তার ওপর রাগও করলেন না। হরকার জন্য সহানুভূতি বোধ করলেন, সে বেচারী যে লজ্জাতেই নিচে দাঁড়িয়েছিল এবং ওপরে আসেনি, সেটা বুঝতে কোনো কষ্ট হলো না। বিপর্যয়ের মুখে মানুষের অসহায়তার কত পরিচয় এ-কদিন ধরে দেখা গেল, অথচ কত অসহায়তা ও লুকনো বিপর্যয় নিয়েই মানুষ সহজভাবে বেঁচে থাকতে পারে, বেঁচে থাকে।

আসলে আমারই অক্ষমতা, পুলকেশ। দাশগুপ্ত বললেন, আমার মতো করে চেষ্টা করেছিলাম অন্তত একটা কাজ করতে। কিন্তু পারিনি। শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে আবার ক্যাম্পেই ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি।

একটু থেমে বললেন, আরেকটা কফি খাও।

কফি তো খাবই। কিন্তু দাদা, একটা কথা বলি, আপনাকে এই রকম ক্লান্ত দেখতে আমাদের ভালো লাগে না। এমন কি হয়েছে?

দাশগুপ্ত সামান্য হেসে বললেন: পুলকেশ, তুমি এঞ্জিনীয়র, ছবি আঁকতে জানো না! জানলে বলতাম, তোমাদের কাজের ক্যানভাসে একটা অক্ষম নিষ্ক্রিয় চরিত্রের মুখ নিয়ে একটা ঠাট্টা আঁকো তো।

এই গল্পের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক।—লেখক